দাম : পাঁচ টাকা

স্বস্তিকা

২৯ আগষ্ট - ২০১১, ১১ ভাদ্র - ১৪১৮ ।।
৬৪ বর্ষ, ২ সংখ্যা

‘প্রিভেনশান অফ কম্যুনাল অ্যাণ্ড টার্গেটেড ভায়োলেন্স বিল - ২০১১’ — টার্গেট হিন্দুরাই

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ❑ ৫

খোলা চিঠি : কমরেড, সর্বহারাদের কি লজ্জাও থাকতে নেই! ❑ ৬

সংবাদ প্রতিবেদন ❑ ৭

তিরিশ বছরে যা হয়নি, তিন মাসে তা হয়েছে! ❑ ৮

সি পি এম সংগঠনের কঙ্কাল বেরিয়ে পড়েছে ❑ ৯

ছিটমহল সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা : একজন অনুপ্রবেশকারীও যেন ছিটমহলবাসীর ছদ্মবেশে এদেশে না থাকে ❑ সাধন কুমার পাল ❑ ১১

প্রস্তাবিত কম্যুনাল অ্যান্ড ভায়োলেন্স বিল : একটি বিপজ্জনক খসড়া ❑ অরুণ জেটলি ❑ ১৩

সোনিয়ার নেতৃত্বাধীন 'এন এ সি' দেশভাগ করতে চাইছে ❑ রাকেশ সিন্‌হা ❑ ১৫

হিন্দু নিধনকারী বিল- ২০১১ ❑ জয়দীপ রায় ❑ ১৭

অসমে সাংসদরাই এলাকা উন্নয়ন তহবিল খরচে ব্যর্থ ❑ ২১

ষোড়শ মহাজনপদ — কম্বোজ ও মৎস্য ❑ গোপাল চক্রবর্তী ❑ ২৪

অমিত মিত্রের কর্পোরেট বাজেট ❑ এন সি দে ❑ ২৫

মীরজাফর যুগ যুগ জীও! ❑ শিবাজী গুপ্ত ❑ ৩০

বাস্তব থেকে বহু দূরে 'আমি সুভাষ বলছি' ❑ বিকাশ ভট্টাচার্য ❑ ৩১

নিয়মিত বিভাগ

এই সময় : ১০ ❑ অন্যরকম : ২০ ❑ চিঠিপত্র : ২২ ❑ ভাবনা-চিন্তা : ২৩ ❑ নবাঙ্কুর : ২৭ ❑ কেরিয়ারের ঠিক-ঠিকানা : ২৮ ❑ সমাবেশ-সমাচার : ২৯ ❑ শব্দরূপ : ৩২ ❑ চিত্রকথা : ৩৩

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

'কম্যুনাল অ্যাণ্ড টার্গেটেড ভায়োলেন্স বিল- ২০১১' — টার্গেট হিন্দুরাই— পৃঃ ১৫-১৭

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৪ বর্ষ ২ সংখ্যা, ১১ ভাদ্র, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ

যুগাব্দ - ৫১১৩, ২৯ আগষ্ট - ২০১১

দাম : ৫ টাকা

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Registration No.-Kol.RMS/048/2010-2012

LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT

L. No.-MM & P.O. / SSRM-KOL.RMS RNP-048/LPWP-028/2010-12

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

আন্নার জয়লাভ

অনশন শুরুর আগেই জয়লাভ ব্যতীত আর কীই বা বলা যাইতে পারে? আন্না হাজারে-কে মুক্তি দিয়া অনশনে বসিবার অনুমতি ও ব্যবস্থাপনা করিয়া দিতে শেষ পর্যন্ত কেন্দ্র সরকারকে বাধ্য হইতে হইল। অথচ দুইদিন পূর্বেও সরকারী প্রশাসন জে পি পার্কে সমাবেশ বানচাল করিতে ১৪৪ ধারা জারি করিয়া আন্না হাজারে-কে গ্রেপ্তার করিয়াছিল। বাস্তবে আন্না হাজারে-কে খাতায়-কলমে গ্রেপ্তার দেখানো হইবে বা হইয়াছে কিনা তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা সম্ভব নয় অন্ততঃ এই মুহূর্তে।

তবে যেখানে ১৪৪ ধারা প্রয়োগ করা হইয়াছিল, তদ্‌পরিবর্তে পশ্চাৎ অপসরণ করা এবং দিল্লীতেই রামলীলা ময়দানে আরও অধিক লোকজন লইয়া অনশন সত্যাগ্রহে বসিবার অনুমতি না দিয়া সরকারের আর গত্যন্তর ছিল না। আন্না হাজারে-কে আটক করিবার পর সারা ভারত জুড়িয়া যুবসমাজ এবং সর্বসাধারণ জনতা যে ভাবে যে ভাষায় সমর্থন জানাইয়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে মিছিল বাহির করিয়াছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের তোয়াক্কা না করিয়া রাস্তায় নামিয়া আসিয়াছে তাহাতেই সরকারের টনক নড়িয়াছে। সরকার অদ্যাবধি দুর্নীতি নাই, ভ্রষ্টাচার নাই বা বিদেশে ভারতীয়দের কালো টাকা গচ্ছিত নাই—ইহা বলিতে পারেন নাই। দুর্নীতি ও ভ্রষ্টাচারের কারণেই জনসাধারণের প্রাণ ওষ্ঠাগত, দেশ দুরবস্থা-কবলিত, দ্রব্যমূল্য আকাশছোঁওয়া। অথচ মুষ্টিমেয় লোক দুর্নীতির সুবাদেই ঠাণ্ডা ঘরে, ঠাণ্ডা গাড়িতে আরামে জীবন অতিবাহিত করিতেছে। যে সকল জনপ্রতিনিধি (সাংসদ) সংসদকেই একমাত্র ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু বলিয়া সদম্ভে গর্বোক্তি করিয়া চলিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও রহিয়াছেন। এ সময় ভারতবর্ষের নাম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ সমূহের তালিকায় ক্রমান্বয়ে শীর্ষস্থান দখলের দিকে অগ্রসর হইতেছে। তাই কেন্দ্র সরকারের মুরুব্বিরা সমাজকর্মী তথা প্রবীণ গান্ধীবাদী নেতা আন্না হাজারের অনশনের হেতু লইয়া কোনও ওজর-আপত্তি তুলিতে পারেন নাই।

কেন্দ্র সরকারের গাত্রদাহ আন্নার অনশনের স্থান ও পদ্ধতি লইয়া। তাহারা রাজধানী দিল্লী ও দিল্লীর জনসমাগমস্থলরূপী পার্কগুলিকে নিজেদের পৈতৃক সম্পত্তি বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। যাহারা নিজেদেরকে গান্ধী পদবী ও গান্ধীবাদ-এর (যার অন্যতম নীতি-অনশন) একমাত্র উত্তরাধিকারী বলিয়া ধরিয়া লহেন তাহারাই আন্না হাজারেকে দিল্লীর জে পি পার্কে অনশন সত্যাগ্রহে বসিতে বাধা দিয়াছেন! শুধু বাধা দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই আন্না হাজারেকে তিহার জেলে আটকও রাখিয়াছিলেন!

প্রধানমন্ত্রী ও তাহার কোটারির 'মহানুভব'দের জানা উচিত জনগণই একমাত্র ক্ষমতায় বসাইবার অধিকারী। তবে কিনা পাঁচবছর অন্তর এই সুযোগ আসে। তবে সর্দারজী ডঃ মনমোহনের ক্ষেত্রে সেই সুযোগ নাই। কেননা তিনি পাকিস্তানে জন্মগ্রহণ করিয়া দেশভাগজনিত কারণে পাঞ্জাবের অধিবাসী হইয়া গুয়াহাটি হইতে রাজ্যসভায় নির্বাচিত হইয়া লাগাতার দুইবার দেশের ১২০ কোটি জনতার মাথায় হাত বুলাইয়া প্রধানমন্ত্রীর কুর্সীতে আসীন হইয়াছেন। ইহাও দেশের প্রচলিত আইনের সুযোগ লইয়া বেকুব জনগণকে একপ্রকার ধোঁকা দেওয়া ছাড়া আর কি? সংসদকে যাঁহারা মাছের বাজারে পরিণত করেন, যাঁহারা কোটি কোটি টাকায় নিজেদের বিক্রী (আস্থা ভোটের সময়) করেন, তাহাদের 'সংসদ' 'সংসদ' বলিয়া গলাবাজি করাটা সাজে না। কেননা ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই সাংসদ।

সংসদের গরিমা তখনই, যখন সাংসদরা দেশের জনগণকে দুর্নীতি ও ভ্রষ্টাচার মুক্ত প্রশাসন ও ব্যবস্থা প্রদান করিতে পারিবেন। যাহাদের মন্ত্রী দুর্নীতির দায়ে জেলে বন্দী, তাহাদের মুখে আন্না-বিরোধিতা শোভা পায় না। সরকারের সুমতি ফিরিয়া আসুক, জনলোকপাল বিলে তাবৎ জনপ্রতিনিধিদের সামিল করিয়া সরকার ও সংসদও নিজেদের গরিমা বজায় রাখুন—এক্ষণে ইহাই কাম্য।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

মানুষের একটা দিক আছে যেখানে বিষয়-বুদ্ধি নিয়ে সে আপন সিদ্ধি খোঁজে! যেখানে আপন ব্যক্তিগত জীবনযাত্রা নির্বাহে তার জ্ঞান, তার কর্ম, তার রচনা শক্তি একান্ত ব্যাপৃত, সেখানে সে জীবরূপে বাঁচতে চায়।

কিন্তু মানুষের আর একটা দিক আছে যা এই ব্যক্তিগত বৈষয়িকতার বাইরে। সেখানে জীবনযাত্রার আদেশে যাকে বলি ক্ষতি তাই লাভ, যাকে বলি মৃত্যু সেই অমরতা। সেখানে বর্তমান কালের জন্য বস্তু সংগ্রহ করার চেয়ে অনিশ্চিত কালের উদ্দেশ্যে আত্মত্যাগ করার মূল্য বেশি। সেখানে জ্ঞান উপস্থিত প্রয়োজনের সীমা পেরিয়ে যায়, কর্ম স্বার্থ প্রবর্তনকে অস্বীকার করে। সেখানে আপন স্বতন্ত্র জীবনের চেয়ে যে বড় জীবন সেই জীবনে মানুষ বাঁচতে চায়।

স্বার্থ আমাদের যে সব প্রয়াসের দিকে ঠেলে নিয়ে যায় তার মূল প্রেরণা দেখি জীব প্রকৃতিতে। যা আমাদের ত্যাগের দিকে তপস্যার দিকে নিয়ে যায় তাকেই বলি মনুষ্যত্ব, মানুষের ধর্ম।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কমরেড, সর্বহারাদের কি লজ্জাও থাকতে নেই!

মাননীয়
কমরেডগণ
আলিমুদ্দিন স্ট্রিট, কলকাতা

স্লোগানে শুনেছি আপনারা তো সর্বহারা। লোকে যাই বলুক আপনাদের স্লোগান বলছে 'সর্বহারার হারানোর কিছু নেই।' সব কিছুই তাঁরা খুইয়ে বসে আছেন। তা বলে কি লজ্জাও থাকতে নেই!

এই যে সুশান্ত-কাণ্ড বা কঙ্কাল-কাণ্ড। কী কাণ্ডটা হলো বলুন তো! একে তো কঙ্কাল কাণ্ড তাতে আবার অস্ত্রের কারখানা। সব মিলিয়ে কাণ্ড- কারখানা দেখে তো মশায়েরা, আক্কেল গুড়ুম হয়ে যাচ্ছে।

মাননীয় বামকুলপতিদের একবার স্মরণ করিয়ে দিই মাস তিনেক আগের কথা। ১৩ মে মিটেছে রাজ্যের ভোট পর্ব। আপনারা চলে গেলেন। রেখে গেলেন শূন্য অর্থভাণ্ডার আর পূর্ণ অস্ত্রভাণ্ডার। তার প্রমাণ পাওয়া গেল পশ্চিম মেদিনীপুরেই। মাটির তলায় সে কী কাণ্ড-কারখানা! এখানে খুঁড়লে অস্ত্র তো ওখানে খুঁড়লে কঙ্কাল, হাড়গোড়। একটা সময় মনে হচ্ছিল ওই জেলার প্রধান খনিজ সম্পদ বুঝি অস্ত্র আর হাড়গোড়!

আপনারা বলেছিলেন রাজনৈতিকভাবে এর বিরুদ্ধে লড়াই করবেন। করেছেনও তাই। বলেছেন ওখানে অস্ত্র আর কঙ্কাল পুঁতে তারপর আপনাদের ফাঁসানো হয়েছে। চুপি চুপি বলি, কেউ বিশ্বাস করেনি জানেন! এমনকী আপনাদের অনুগত যারা তারাও নয়। সবাই বলছে মন্ত্রীর বাড়িতে অবৈধ ওয়্যারলেস ফোন কেন থাকত তা সবাই জানে। আরে বাবা ওটা দিয়ে তো পুলিশের গতিবিধিতে আড়ি পাতা যায়, অ্যাকশনের নির্দেশ দেওয়া যায়।

আপনাদের নেতা সুশান্ত ঘোষের কিন্তু ক্ষমতা আছে। এই চিঠি লেখার সময় অবশ্য সিআইডি হেফাজতে গারদে বসে গান্ধীগিরি করছেন। নাওয়া- খাওয়া বন্ধ করেছেন। তবে উনি কিন্তু মোটেই নিরামিশাষী নন। রীতিমতো উগ্র কমরেড। এমনকী তিনি এটাই বিশ্বাস করেন, 'বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস।'

কর্মসূত্রে এই পত্রলেখকের বেশ কিছু দিন শ্রীযুক্ত সুশান্ত ঘোষকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে। তাঁর ঠোঁটের কোণে সব সময় লেগে থাকে একটা প্রশান্ত হাসি। কিন্তু যারা পড়তে জানে তারা ওই আলগা হাসির মধ্যে অনেক ভাষা খুঁজে পায়। হাসতে হাসতেই উনি অনেক কান্না চাপা দিয়ে দিতে পারেন। যেমন করে চাপা দেওয়া হয়েছিল বেনাচাপড়ার কঙ্কাল। আর চাপা দেওয়া হয়েছিল সেই কাণ্ডে নিহতদের পরিবারের কান্না।

এসবের জোরেই তো তিনি ছ'ছবারে বিধায়ক। তিনবারের মন্ত্রী। এবার যখন আপনারা কোথাও হালে পানি পেলেন না তখনও গড়বেতা পূর্বে তিনি স্লোগান তুলেছেন এবং করে দেখিয়েছে 'ঝাণ্ডা (পড়ুন অস্ত্র) হামারা উঁচা রহেগা।' এবার উনি যখন ফাঁপরে তখন আপনারা বলেছেন, 'দল তাঁর পাশে থাকবে।' সুশান্তবাবুর স্ত্রী করুণাদেবী হয়তো ভাববেন, এটা দলের করুণা ভিক্ষা নয়, কর্তব্য পালন। কিন্তু আমি বলব এটা আপনাদের বাধ্যবাধকতা। কারণ, উনি মুখ খুললে রাজ্য নেতারা হালে পানি পাবেন না। বেনাচাপড়ার ঘটনাই যে সুশান্ত ঘোষের একমাত্র কলঙ্ক তা তো নয়। এমন অনেক কাণ্ড তিনি ঘটিয়েছেন। বলা ভাল আপনারা রাজ্য নেতারা তাঁকে দিয়ে করিয়েছেন। তাঁকে কেউ বলে গড়বেতার বাঘ (এখন অবশ্য মুষিক)। তাঁর কথার দরকার হোত না, ইঙ্গিতেই বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খেত।

পশ্চিম মেদিনীপুরে বরাবরই আপনাদের মানে সিপিএমের প্রভাব বেশি। কিন্তু ১৯৯৮ সাল নাগাদ সেখানে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির বাড়বাড়ন্ত আপনাদের চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দেয়। দিন দিন বাড়তে থাকে ঘাস ফুল আর পদ্ম ফুলের শক্তি। তখন এটাকে প্রতিহত করার জন্য আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের দরকার ছিল একজন ডাকাবুকো নেতা। শুরু করলেন গ্রাম দখলের লড়াই। কেশপুর থেকে গড়বেতা, চমকাইতলা থেকে ছোট আঙারিয়া এমন অনেক লড়াই দেখল বাংলা। আর কাছ থেকে দেখেছেন এই হতভাগ্য পত্রলেখক। প্রতিদিন জ্বলছে আগুন। চাষের মাঠ রীতিমতো যুদ্ধক্ষেত্র। একদিকে তৃণমূল কংগ্রেস অপরদিকে সিপিএম। এক-নলা, দে-নলার লড়াই, গোলাগুলি। মাওবাদী পি ডব্লু জি-র ছদ্মবেশে বিজেপি কর্মীদের খুন করতে লাগল সিপিএম হার্মাদরা। আর তখনই বাংলা চিনল দাপুটে নেতা সুশান্ত ঘোষকে।

এরপরেই ২০০০ সালে গীতা মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে পাঁশকুড়া লোকসভা কেন্দ্রে হলো উপনির্বাচন। সেবার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বিক্রম সরকার হারিয়ে দিলেন সিপিআই প্রার্থী গুরুদাস দাশগুপ্তকে। আজকের শাসক তৃণমূল দেখিয়েছিল পাঁশকুড়া লাইন। আর তারপরেই সুশান্ত ঘোষের নেতৃত্বে শুরু হলো পাল্টা গড়বেতা লাইন। আবার বারুদ, ধোঁয়া, রক্ত, মৃত্যু। এরপর এন্তাজ আলিকে সঙ্গে নিয়ে কেশপুর লাইন। রেকর্ড ভোটে জিতে মন্ত্রী হলেন নন্দরানী ডল। মনে পড়ছে কমরেডগণ। সেসময় এইসব সশস্ত্র লাইন নিয়ে আপনাদের দলের মধ্যেও তো অনেক বিরোধ ছিল। সেটা যেমন রাজ্যস্তরে ছিল, তেমন ছিল পশ্চিম মেদিনীপুরেও। সেই সব বিক্ষুব্ধদের সিপিএম ক্যাডাররাই খুন করে মাওবাদীদের ওপর দায় চাপিয়ে দিয়েছে। খুন করে তাদেরই শহিদ বেদীতে ফুল মালা দিয়েছে আপনাদের দল।

আপনারা বলছেন, পুরনো মামলায় ফাঁসানো হয়েছে সুশান্ত ঘোষকে। কিন্তু বলুন তো কেশপুর বা গড়বেতায় সুশান্ত ঘোষের নামে অভিযোগ করলে শুনত থানা? তাছাড়া এমন অভিযোগ মুখে আনার জন্য কার ঘাড়ে ক'টা মাথা ছিল?

সুশান্ত ঘোষকে এই চোখ রাঙানি আর পেশি ফোলানোর রাজনীতি তো করতে হয়েছে আপনাদের নির্দেশেই। পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলা সম্পাদক দীপক সরকারের কাছের লোক সুশান্ত ঘোষের ওপর ভরসা করেই দায়িত্ব দিয়েছিল দল নাকি? ব্যক্তিগতভাবে এই 'সুশান্ত ঘোষ লাইন'-এর হয়তো বিরোধী কমরেড বুদ্ধদেব, কমরেড সূর্যকান্ত কিংবা কমরেড বিমান বাবুরা। কিন্তু দলগতভাবে দলের টিকে থাকার প্রশ্নে তাঁরা সেই সময় এই লাইনকেই প্রশ্রয় দিয়েছিলেন। এটা একশো শতাংশ সত্যি যে, সুশান্ত ঘোষ যা যা করেছেন সবই দলের অনুমোদনে। তাই এখন পাশে থাকাটা আপনাদের বাধ্যবাধকতা।

সুশান্ত ঘোষ, দীপক সরকার, এন্তাজ আলিদের চটালে যে অনেক কিছু ফাঁস হয়ে যাবে।

ব্যক্তি সুশান্ত সাজা পাবেন কিনা, পেলে কতটা পাবেন বিচার করবে আদালত। কিন্তু আপনারা প্রতিদিন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিশ্চয়ই লজ্জা পাচ্ছেন!

ও, সর্বহারাদের তো লজ্জাটাও থাকতে নেই।

—**নমস্কারান্তে,**
সুন্দর মৌলিক

মালদা-দিনাজপুর সীমান্তে অনুপ্রবেশ চলছেই

সংবাদদাতা : মালদা ॥ বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী মালদা, দুই দিনাজপুর ও মুর্শিদাবাদ জেলায় সম্প্রতি যে ভাবে অবৈধ অনুপ্রবেশ, জাল নোট ও অস্ত্র ব্যবসা বেড়ে চলেছে তাতে আগামীতে পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাসের চরিত্র বদলের সঙ্গে সঙ্গে অনেক বড় বিপদ এগিয়ে আসছে। প্রতিদিন সীমান্ত সংলগ্ন এই জেলাগুলি বাংলাদেশ থেকে দালালের মধ্যমে শত শত বাংলাদেশী মুসলিম ভারতে প্রবেশ করছে। তারা কাজের সন্ধানে দিল্লী, মুম্বাই, চেন্নাই সহ বড় বড় শহরে যাচ্ছে এবং নিরাপদ আশ্রয়ে এদেশের জাল ভোটার কার্ড নিয়ে দিনের পর দিন বসবাস করছে। গত ১৪ আগস্ট মালদা টাউন স্টেশন থেকে ১২ জন বাংলাদেশীকে এক সঙ্গে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তারা টাউন স্টেশন থেকে ফারাক্কা এক্সপ্রেস ধরে দিল্লী যাওয়ার মতলব করছিল। এদের মধ্যে ৬ জন শিশু যাদের বয়স ৬ মাস থেকে ৫ বছরের মধ্যে ছিল। সেদেশে কাজ না থাকার জন্য দক্ষিণ দিনাজপুরের হিলি বর্ডার দিয়ে রাতের অন্ধকারে মোটা টাকার বিনিময়ে দালাল মারফৎ তারা এদেশে ঢুকেছিল বলে জানিয়েছে। বাংলাদেশের সুনামগঞ্জ জেলার বাসিন্দা মাফিদা বেগম তার ৩ বছর ৬ মাসের পুত্র সন্তান আশমিন শেখকে কোলে নিয়ে এপারে এসেছিল কাজের খোঁজে। এই রকম আরও দু'জন মহিলা অনুপ্রবেশকারীদের মধ্যে ছিল। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি।

কলকাতাতে গত ১৭ আগস্ট ১৭ লক্ষ টাকার জাল নোট সমেত মালদার বৈষ্ণবনগর সবদল পুবের রেজাউল করিম (৪১) ও কালিয়াচকের রাজউল শেখকে (২০) গ্রেপ্তার করার পর বাংলাদেশের সঙ্গে এইসব অপরাধের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের যোগসূত্র পাওয়া গেছে। ১০০০ টাকার নোটগুলি যে বাংলাদেশ হয়ে এদেশে ঢুকছে তা নিশ্চিত হয়েছে গোয়েন্দারা। গত তিন বছরে তিন কোটিরও বেশী জাল নোট ধরা পড়েছে মালদার বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী অঞ্চলে যা এখানকার অর্থনীতিকে পঙ্গু করার পক্ষে যথেষ্ট।

একই চিত্র দুই দিনাজপুর এবং মুর্শিদাবাদ জেলাতে। এবারের সেনসাসে এই তিন জেলার সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে মুসলিম জনসংখ্যা দ্বিগুণ বেড়েছে যা এক অশনি সঙ্কেত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মাসখানে আগে মালদা জেলার পূর্ণমন্ত্রী সাবিত্রী মিত্র এক বিবৃতিতে বলেছেন বাংলাদেশী রিক্সাচালকে মালদা ভরে গেছে। পুলিশকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তাঁরা বলছেন, আমাদের চোখে তো বাংলাদেশী রিক্সাচালক চোখে পড়ছে না। প্রশ্ন হলো, বেড়ালের গলায় ঘণ্টা পরাবে কে?

'বন্দেমাতরম্' ইসলাম বিরোধী : বুখারি

আন্নার আন্দোলন থেকে মুসলিমদের দূরে থাকার ডাক

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্না হাজারের আন্দোলন থেকে মুসলিমদের দূরে থাকতে আহ্বান জানালেন দিল্লী জামা মসজিদের শাহী ইমাম সৈয়দ আহমেদ বুখারি। 'বন্দেমাতরম্' ও 'ভারতমাতা কী জয়'— আন্নার আন্দোলনের এই দুই স্লোগান ইসলাম বিরোধী বলেই বুখারির এহেন আহ্বান। বুখারির বক্তব্য— 'রাষ্ট্র বা দেশভক্তিকে ইসলাম ক্ষমার চোখে দেখে না। এমনকী মায়ের পূজাকেও ইসলাম ক্ষমা করে না যে মা তার সন্তানকে দশমাস গর্ভে ধারণ করে থাকে। মুসলিমরা তাই কিভাবে আন্নার আন্দোলনকে সমর্থন করবে যা ইসলামের মূল তত্ত্বেরই বিরোধী। একারণেই এই আন্দোলন থেকে মুসলিমদের দূরে থাকতে আহ্বান জানাচ্ছি।' এই দেশের মূল ধারা থেকে ইসলামের নামে মুসলিমরা যে বিচ্ছিন্ন হয়েই থাকতে চায়, বুখারির এই বক্তব্যে তা আরও একবার উঠে এল। বুখারির এই আহ্বান শতাব্দী প্রাচীন 'বন্দেমাতরম্' প্রসঙ্গটিকেই আবার সামনে নিয়ে এল। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে রণধ্বনিই ছিল 'বন্দেমাতরম্'। মুসলিমরা পৌত্তলিকতার অভিযোগে যেমন 'বন্দেমাতরম্' গাইতে অস্বীকার করে। যদিও সাম্প্রতিককালেও লতা মঙ্গেশকরের 'বন্দেমাতরম্' গান এবং এ. আর রহমান-এর 'মা তুঝে সালাম' এই গীতটিকে আরও জনপ্রিয় করে তোলে।

বুখারি

বুখারি মনে করেন, দুর্নীতি নয়, সাম্প্রদায়িকতাই এই দেশের অগ্রগতির ক্ষেত্রে প্রধান বাধা। দেশের মানুষ কিন্তু বুখারির এই মতের সঙ্গে সহমত নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সম্প্রতি 'টাইমস অফ ইন্ডিয়া'-র প্রকাশিত এক সমীক্ষায় দেখা গেছে এদেশের যুবসমাজের ৬১ শতাংশই মনে করেন, জাতপাত বা সাম্প্রদায়িকতা নয়, দুর্নীতিই স্বাধীনোত্তর ভারতের উন্নয়নে বাধা। আন্না আন্দোলনকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন না, বরং আর এস এস-এর মতো সংগঠন এবং বিজেপি-র মতো রাজনৈতিক দলকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন বলে বুখারি অভিযোগ করেছেন। তাঁর প্রশ্ন, একটা ছোট অনুষ্ঠানকেও সফল করতে লাখ টাকা দরকার হয়। তাহলে এই আন্দোলনের টাকা আসছে কোথা থেকে?

তবে বুখারির এই বক্তব্যকে 'ব্যক্তিগত' বলে বর্ণনা করেছেন অল ইন্ডিয়া উলেমা (ক্লারিকস) কাউন্সিল-এর সাধারণ সম্পাদক মৌলানা মহম্মুদ দারিয়্যাবাদী **(Daryabadi)**। মহারাষ্ট্রের ফেডারেশন অফ মাইনরিটিস-এর এক সদস্য বলেছেন, দুর্নীতি আজ সব ভারতীয়কে বিপন্ন করেছে এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে এই আন্দোলনে মুসলিমরা আন্নার সঙ্গে আছে। অর্থাৎ মুসলিমদের একাংশ বুখারির এই ডাককে উপেক্ষা করছে বলে ওয়াকিবহাল মহলের অভিমত।

সি পি এম সংগঠনের কঙ্কাল বেরিয়ে পড়েছে

নিশাকর সোম

সিপিএমের হার্মাদ-চরিত্রটা বেরিয়ে এসেছে সুশান্ত ঘোষের গ্রেপ্তারের পরবর্তী ঘটনায়। উদ্ধার হয়েছে বিশাল অস্ত্র-ভাণ্ডার। সুশান্ত ঘোষের কলকাতার সরকারি আবাসন থেকে পাওয়া গেছে পাঁচ লক্ষাধিক টাকা। সেটা বাজেয়াপ্ত করাও হয়েছে। কঙ্কাল কাণ্ডের কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়েছে। বারবার এই কলমে যা লেখা হয়েছিল—সিপিএম মানি আর ম্যাসলম্যান দিয়ে এযাবৎ নির্বাচনে জয়ী হয়েছে, আজ তাই সত্য বলে প্রমাণিত হচ্ছে। এই নৃশংস হত্যা কবে, কোথায় হয়েছিল এবং গ্রামের কতজন নিরীহ গরীব কৃষক এর জন্য বলি হলেন তার সন্ধান সি আই ডি করুক। তবে এটা বলতেই হচ্ছে যে গরীব কৃষকদের জন্য 'কৃষিবিপ্লব তথা গণতান্ত্রিক বিপ্লবের' ফানুস উড়িয়ে ও তার কর্মসূচী তৈরি করে সিপিএম পার্টি তৈরি হয়েছিল। সেটা যে ধাপ্পাবাজিই ছিল তা এখন বাস্তবে প্রকটিত হয়ে গেল।

যদিও এসব জল্লাদ নীতির স্থপতি হলেন সুশান্ত-দীপক সরকার অ্যান্ড কোং। রাজ্যপার্টি নেতৃত্ব অর্থাৎ বিমান-বুদ্ধ-বিনয়-নিরুপমের কি এই নরবলিতে সমর্থন ছিল না? উল্লেখ করা দরকার যে রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য দীপক দাশগুপ্তের উপর মেদিনীপুরের পার্টি সংগঠনের দায়িত্ব ছিল। এখানে তাঁর ভূমিকাই বা কি ছিল? আজকে সিপিএম পার্টির নেতারা পার্টিকে সচেতনভাবেই জল্লাদবাহিনীতে পরিণত করেছেন। তবে এটা ঠিক এ-নৃশংসতা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সহজে ভুলতে পারবেন না।

সিপিএমের নিচেরতলার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য এই ঘটনায় স্তম্ভিত এবং ক্ষুব্ধ। তার প্রকাশ দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন জেলার বর্ধিত জেলা কমিটির সভায়। কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, বাঁকুড়াতে পার্টি নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বস্তুত 'বিদ্রোহ' দেখা যাচ্ছে। তাদের বক্তব্য সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের ভ্রান্ত নীতি নিয়েছিলেন বুদ্ধ-নিরুপম, আর তাদের চোখ বুজে সমর্থন জানিয়েছিলেন বিমান বসু, বিনয় কোঙার, মদন ঘোষ, সমর বাওড়া প্রমুখেরা।

সিপিএমের বর্ধিত রাজ্য-কমিটির সভা অর্থাৎ প্লেনামে এই ক্ষোভ- সমালোচনা উঠে আসবে। সিপিএমের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সামনে জেলার নেতারা রাজ্য-নেতাদের কীর্তি ফাঁস করে দেবেই। শোনা যাচ্ছে বুদ্ধবাবু নাকি সুশান্ত ঘোষকে একেবারেই পছন্দ করতেন না। তাকে কার্যত কোনও ক্ষমতা দেওয়ারও বিরোধী ছিলেন। এ ঘটনা সিপিএমের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কি জানতেন? নাকি তাঁরা অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের ভূমিকা নিয়েছিলেন?

এ-রাজ্যে সিপিএমের প্রতিটি জেলা-পার্টির অবস্থা ছন্নছাড়া। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভাবে পচন দেখা যাচ্ছে কলকাতা জেলাতে। কলকাতা জেলার রিপোর্টে বুদ্ধদেব-নিরুপম-বিমান বসুর সঙ্গে প্রাক্তন মন্ত্রী তথা কলকাতা ও রাজ্য-কমিটির সদস্য মানব মুখার্জির সমালোচনা করা হচ্ছে। এমনকী মানবের আপ্ত সহায়ক বিষ্ণুবাবুর ঔদ্ধত্যের কথাও উঠেছে।

জেলা-পার্টি নেতৃত্ব জেনেশুনে এই অবস্থার বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি।

সম্প্রতি সিপিএমের কলকাতা জেলা কমিটি শিয়ালদহের লোকাল কমিটি ভেঙে দিয়েছে এবং এই লোকাল কমিটির সম্পাদক কাজল দত্ত ও সদস্য দেবাশিস রায়-কে পার্টি থেকে বহিষ্কারও করা হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সুরেন্দ্রনাথ কলেজে ছাত্র ভর্তির জন্য অর্থ আদায় এবং ডিমের গাড়ি থেকে তোলা আদায়। শিয়ালদহ লোকাল কমিটির সম্পাদক ছিলেন কাজল দত্ত, তিনিও তো ডিম ব্যবসায়ী। এখন এই কমিটি ভেঙে যে লোকাল অর্গানাইজেশন কমিটি গঠন করা হয়েছে সেই কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছে কর্পোরেশনের প্রাক্তন কাউন্সিলার প্রভাত চ্যাটার্জিকে। এই প্রভাত চ্যাটার্জি নিজে কাউন্সিলার হয়েছিলেন, জোর জবরদস্তি করে কাউন্সিলার করেছিলেন তাঁর মা মায়া চ্যাটার্জিকে। এরপর প্রভাত চ্যাটার্জি-র বিরুদ্ধেও নাকি বহু অভিযোগ ওঠায় তাঁকে হকার্স-ইউনিয়নে সরিয়ে আনা হয়েছিল। আসলে ছ'য়ের থেকে সাতের দশকের সম্পাদক কেবলমাত্র লক্ষ্মী সেনের আনুকূল্যে গোষ্ঠীবাজি করে শিয়ালদহ পার্টির অন্তিম যাত্রার ব্যবস্থা করেছিলেন।

বামফ্রন্ট কার্যত আলোচনা সভায় পরিণত হয়েছে। ফরওয়ার্ড ব্লক নিজস্ব কায়দায় 'স্বাধীন কর্মসূচী' নিয়ে এগোচ্ছে। আর এস পি রাজ্য-কমিটির অস্থায়ী সম্পাদক হিসাবে ক্ষিতি গোস্বামী অধিষ্ঠিত হয়ে নিজের গোষ্ঠীকে শক্তিশালী করবেন এবং তাঁর স্ত্রী-কন্যা, যাঁরা মমতা-ভক্ত তাঁরাই তো পার্টির কাজে প্রতিপদে হস্তক্ষেপ করবেনই। সিপিআইও সিপিএমের 'দাদাগিরি'র বিরুদ্ধে এখন সরব হচ্ছে।

অপরদিকে মমতা-মন্ত্রিসভার তিনমাস পূর্তি হলো। মমতাপন্থী সংবাদপত্রের কথায় এই তিন মাসে প্রতিশ্রুত কর্মসূচীর ৭৫ ভাগ করা হয়ে গেছে। এদিকে তৃণমূল সাংসদ কবীর সুমন এক বেসরকারি বৈদ্যুতিন চ্যানেলে বিভিন্ন ব্যাপারে তীব্র সমালোচনা করেছেন তৃণমূল সরকারের। তাঁর জবাবে তাঁকে পদত্যাগ করার হুমকি দিয়ে মমতাপন্থী সাংবাদিক বিশেষ প্রতিবেদনও লিখেছেন! মাঝেমধ্যে এই সাংবাদিকের লেখা পড়ে মনে হয় তিনিই যেন তৃণমূলের 'ফ্রেন্ড, ফিলোজফার অ্যান্ড গাইড'!

৭৫ ভাগ কাজের মধ্যে লন্ডন ও সুইজারল্যান্ডের জন্য উদ্যোগ আছে! যদিও রাজ্যের ৬-৭টি জেলা বন্যাপ্লাবিত হওয়ায় তাঁরা এখন সাহায্যের জন্য আর্তনাদ করছেন। বিধানসভায় এক নতুন নজির দেখা গেল যে ৭-৮টি দপ্তরের ব্যয়বরাদ্দ গিলোটিন করা হলো! যদিও শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু শিক্ষাদপ্তরের কাজকর্মের খতিয়ান দিতে গিয়ে বহুভাবেই বিগত বামফ্রন্ট সরকারের শিক্ষা দপ্তরের প্রশংসাই করেছেন!

অপরদিকে মন্ত্রিসভায় জমিনীতি তৈরি হলো না। কংগ্রেসি মন্ত্রী ডাঃ মানস ভুঁইয়া মন্ত্রিসভার বৈঠকে আপত্তি জানিয়ে বলেছেন যে তিনি কোর কমিটির সদস্য হলেও তাঁকে কোর কমিটির কোনও সভাতেই ডাকা হয়নি। এমনকী তাঁর সঙ্গে জমিনীতি নিয়ে কোনও আলোচনাই নাকি করা হয়নি। রাজ্যে কংগ্রেস-তৃণমূল সম্পর্ক তিক্ত হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব রাজ্য কংগ্রেসকে বলি দিয়েও তৃণমূলের তুষ্টি করবে ইউপিএ-২নং সরকারকে বাঁচাতে। যেন-তেন-প্রকারেণ ক্ষমতা আঁকড়ে থাকা অন্তত উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচন পর্যন্ত। দুর্নীতির ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকার কোণঠাসা। ভবিষ্যতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেবার নয়। এ-রাজ্যে সি ই এস সি বিদ্যুতের মূল্য বাড়াতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। তরিতরকারির দাম ৫০-৬০ টাকা কেজি। চালের দর ঊর্ধ্বমুখী। অথচ রাজ্য-কেন্দ্র উভয় সরকারই ভাবলেশহীন।

তিরিশ বছরে যা হয়নি তিন মাসে নাকি তা হয়েছে!

গূঢ়পুরুষের কলম

গত শনিবার ২০ আগস্ট মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মা মাটি মানুষের' সরকার অথবা পরিবর্তনের সরকারের মহাকরণ দখলের তিন মাস পূর্ণ হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর নয় মন্ত্রী (পড়ুন নবরত্ন) ২০ মে রাজভবনে শপথ নিয়ে মহাকরণে ঢুকে ছিলেন। ওইদিনই তিনি মহাকরণে তাঁর মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকটিও করেছিলেন। তাই ২০ মে, ২০১১ মমতা সরকারের জন্মদিন বলেও চিহ্নিত করা যায়। সরকারের জোট শরিক কংগ্রেস দল শনিবার সেই জন্মদিন বয়কট করলেও তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা পাড়ায় পাড়ায় মাইক বাজিয়ে উৎসব করেছে। মমতা দাবি করেছেন, গত ৩০ বছরে বামফ্রন্ট সরকার যে সব কাজ করতে পারেনি, তা তাঁর সরকার মাত্র তিন মাসে করে দেখিয়েছে। প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন যে শীঘ্রই পুস্তিকা আকারে সরকারের সেইসব উন্নয়নমূলক কাজের ফিরিস্তি রাজ্যবাসীকে দেওয়া হবে।

গত তিন মাসে সাফল্যের যে সব দাবি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করেছেন তার মধ্যে আছে, সিঙ্গুরে টাটাদের প্রকল্পের জমি ফেরৎ নিয়ে রাজ্য সরকার অতীতে জমিদানে অনিচ্ছুক কৃষকদের সেই জমি ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। হ্যাঁ, নীতিগতভাবে রাজ্য সরকার অনিচ্ছুক চাষীদের জমি ফিরিয়ে দিতে চেয়েছে। বাস্তবে এক কাঠা বা এক ছটাক জমিও কেউ ফেরৎ পায়নি। কারণ, হাইকোর্টে এখন সিঙ্গুর প্রকল্পের জমির মালিকানা নিয়ে রতন টাটাদের সঙ্গে রাজ্য সরকারের মামলা চলছে। এই জাতীয় দেওয়ানি মামলার ফয়সালা হতে বহু বহু বছর লাগে। এখন মামলা চলছে কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চে। যে পক্ষ হারবে সে পক্ষ হাইকোর্টের ডিভিসন বেঞ্চে আপিলে যাবেই। সেখানে যে পক্ষ হারবে সে পক্ষ সুপ্রিম কোর্টে আপিল মামলায় যাবে। এইভাবেই বছরের পর বছর চলবে আদালতে আইনের লড়াই। তাই সিঙ্গুরের অনিচ্ছুক চাষীদের জমি ফেরৎ দেওয়ার দাবি এখনই করা যায় না। করলে তা আদালতে বিচারাধীন বিষয়ে নাক গলানো হবে। আইনের পরিভাষায় 'কনটেম্পট অফ কোর্ট' হয়।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য দাবি, তাঁর সরকার অতি অল্প সময়ে দার্জিলিং পাহাড় সমস্যার সমাধান করেছে। সত্যি কী পৃথক গোর্খাল্যান্ডের দাবি আর নেই। গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার নেতাদের কথাবার্তা শুনলে তা মনে হয় না। বাস্তব হচ্ছে, পাহাড়ে প্রশাসনিক ক্ষমতা ও অধিকার নিয়ে মোর্চার সঙ্গে মমতার সরকারের একটি চুক্তি হয়েছে। তবে এই চুক্তি লাগু হতে আরও কিছুটা সময় লাগবে। তাই বলা যেতে পারে পাহাড় সমস্যার সমাধানে বর্তমান রাজ্য সরকার ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়েছে। পাহাড় সমস্যা মিটে গেছে এমন কথা বলার সময় এখনও আসেনি। বিগত বামফ্রন্ট সরকার দার্জিলিং পাহাড় সমস্যার সমাধান করতে চায়নি। বাম নেতারা পাহাড় ও সমতলের মানুষের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে দলীয় রাজনীতি করেছে তিন দশক ধরে। সেই অর্থে পৃথক গোর্খাল্যান্ডের দাবির জনক সিপিএম। সুবাস ঘিসিংকে শিখণ্ডী খাড়া করে পাহাড়ে আগুন জ্বালিয়ে রেখেছিল তারাই।

তিন মাসে সাফল্যের খতিয়ানে আরও অনেক কিছু আছে। যেমন, জমি অধিগ্রহণের নয়া সরকারি নীতি। এক লক্ষ বেকারদের চাকরি। রাজ্যের নতুন নামকরণ ইত্যাদি। প্রতিটি বিষয় নিয়ে রাজ্যজুড়ে বিতর্ক চলছে। গত তিনমাসে ১ লক্ষ বেকারের কর্মসংস্থান হয়েছে অথচ রাজ্যবাসী টেরটিও পায়নি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং না জানালে কেউই জানতে পারতো না। আপনার আমার পাড়ার বেকার ছেলেরা কিন্তু আজও কাজের খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরছে। ভাগ্যবান সেই ১ লক্ষ বেকারের দলে তাদের নাম নেই। রাজ্যের নতুন নামকরণ নিয়েও বিতর্ক চলছে। তবে একটা ব্যাপারে সকলেই একমত যে বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের মতামতই শেষ কথা কথা হতে পারে না। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের গুণীজনের পরামর্শও শোনা যেতে পারতো। শোনা হচ্ছে না। কেন? কেউ জানে না। তাই রাজ্যের নতুন নামকরণটিকে মা মাটি মানুষের সরকারের সাফল্য বলে মানতে পারছি না। যেমন মানতে পারছি না কলকাতার গঙ্গাতীরের সৌন্দর্যায়ন বেশি জরুরী বর্ষায় ভেঙে পড়া পথঘাটের মেরামতির থেকে। রাজ্যের বেহাল শিক্ষা স্বাস্থ্যের পরিকাঠামোর উন্নয়নের চেয়ে বেশি জরুরী 'পশ্চিমবঙ্গ' নামকরণ! মনে রাখতে হবে রাজ্যের নাম পরিবর্তনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে হাজার কোটি টাকা খরচের ধাক্কা। যেমন, রাজ্যের সমস্ত গাড়ির নম্বর প্লেট বদল করতে হবে। রাজ্যজুড়ে সরকারি-বেসরকারি অফিসের সাইনবোর্ড পাল্টাতে হবে। আদালত থেকে সরকারি ফাইলের নথিপত্র নতুন নামে ছাপাতে হবে ইত্যাদি। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য একদা 'ক্যালকাটা' নামটি বদল করে কলকাতা বা কলকাতা রেখেছিলেন। তার ধাক্কায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলকাতা পুলিশ চোখে সর্ষে ফুল দেখেছিল। কলকাতা পুলিশকে সংক্ষেপে 'সি-পি' বলা হোত। এখন সে 'ক-পু' হয়েছে। এই 'সি-পি' থেকে 'ক-পু' হতে কত কোটি টাকা খরচ হয়েছে লালবাজারের বড়কর্তারা আজও জানাননি। কত কাটমানির খেলা চলেছিল তাও অজানা। তবে বোঝা যায় কেন সরকারি বড় বড় কর্তারা নাম বদলে অতি উৎসাহ দেখান। মমতা প্রতিদিনই রাজ্যবাসীকে নানা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। শিলান্যাস করছেন। খুবই ভাল কথা। অতি দ্রুত চলাটাই তাঁর বিশেষ স্টাইল। কচ্ছপের গতি তাঁর নাপসন্দ। শশকের গতিতে তিনি সদাই শশব্যস্ত থাকতে ভালবাসেন। তবে একটা সেই চালু কথা আছে যে ধীর স্থির শান্তগতি কচ্ছপই শেষ পর্যন্ত দ্রুতগতি খরগোশকে দৌড় প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দিয়েছিল। তাই বলছি, দ্রুত সিদ্ধান্ত নিলেই হবে না একই সঙ্গে সিদ্ধান্তটি সঠিক হতে হবে। নতুন সরকারের সবে যাত্রা শুরু হয়েছে। এখনও ৪ বছর ৯ মাস সময় হাতে আছে। দ্রুত নয় রাজ্যবাসী চায় সঠিক সিদ্ধান্ত।

পাঠ্যসূচীতেও 'সত্যাগ্রহ'

পাঠক্রমের বিষয় 'সত্যাগ্রহ'। স্কুলের নাম সন্ত নীলোবরায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়। সারা মহারাষ্ট্র থেকে ৩৭৫ জন ছাত্র হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করেন। হোস্টেলের নাম 'যাদববাবা বসতিগৃহ'। স্কুল পরিচালন সমিতির নাম— যাদববাবু শিক্ষণ প্রচারক সংস্থা। রয়েছে মহারাষ্ট্রের রালেগাঁও সিদ্ধি গ্রামে। এই গ্রামই হলো সমাজকর্মী প্রবীণ গান্ধীবাদী নেতা আন্না হাজারের গ্রাম। 'সত্যাগ্রহ' বিষয়টি শুরু হয়েছে গত এপ্রিল থেকে। এখানে সত্যবাদিতা, আত্মরক্ষা (Self Defence), শারীরিক পটুতা এবং কঠোর পরিশ্রমের রীতিমতো অনুশীলন হয়। হাতে-কলমে সত্যাগ্রহের শিক্ষাও নতুন যুক্ত হয়েছে। বলা বাহুল্য 'যাদববাবা শিক্ষণ প্রচারক সংস্থা' প্রতিষ্ঠা করেছেন সর্বজন পরিচিত বর্তমানে দুর্নীতির বিরুদ্ধে অনশনরত আন্না হাজারে। তাঁর বর্তমান কর্মসূচীতে এই ছাত্রদেরও মুখ্য ভূমিকা রয়েছে।

গত ১৬ আগস্ট সন্ত নীলোবারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ১০০ জন ছাত্র দিল্লীতে গ্রেপ্তার বরণ করেছে আন্না হাজারেকে দিল্লী পুলিশ আটক করার পর। তাদের মধ্যে অর্ধেক অর্থাৎ পঞ্চাশ জন দশম শ্রেণীর। অষ্টম শ্রেণীর জনৈক ছাত্র উমেশ জয়সওয়ালও জানিয়েছে— ''আমার বাবা সব শুনে রেগে গিয়েছিলেন। কিন্তু আমি বাবাকে বলেছি, আমি দেশের জন্য লড়াই করছি।''

প্রতিবাদের জন্যে স্কুলের কর্মসূচীর একটু রদ-বদল করা হয়েছে। আন্না হাজারে ওখানে থাকলে সপ্তাহে একদিন স্কুল পরিদর্শন করেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন, শান্তিপূর্ণভাবে অন্যায়ের প্রতিবাদ জানাতে সকলকে উৎসাহিত করেন। বিশেষ করে যারা দুর্বল, প্রতিবাদে অক্ষম তাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য প্রেরণা দেন।

পাল্টা জবাব

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কেন্দ্রীয় কার্যকরী মণ্ডলের সদস্য ইন্দ্রেশকুমার কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা ন্যাশন্যাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি-কে আইনী নোটিশ পাঠালেন। এখানে উল্লেখ্য আজমীর বিস্ফোরণে জোর করেই ইন্দ্রেশজীকে জড়ানো হচ্ছে। উনি সমাজের সেবায় নিবেদিত প্রাণ। গত ১ আগস্ট একটি প্রাইভেট নিউজ চ্যানেলের অনুষ্ঠানে 'আজমীর বিস্ফোরণ' বিষয়ে একটি অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়েছিল। নোটিশে বলা হয়েছে ওই অনুষ্ঠান চলতি তদন্ত প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে এন আই এ-র পৃষ্ঠপোষকতায় প্রচারিত হয়েছে।

কেন্দ্রের অভিসন্ধি

কর ফাঁকি কাণ্ডে ধৃত হাসান আলিকে বাঁচানোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অভিসন্ধি ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছে দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের কাছে। গত ১৮ আগস্ট এই মামলায় শুনানির সময় লক্ষণীয় ভাবে কেন্দ্রীয় আইন আধিকারিকদের উপস্থিতি কম থাকায় দৃশ্যতই

ক্ষুব্ধ সুপ্রিমকোর্ট স্পষ্টই জানিয়ে দেয়, প্রয়োজনে হাসান আলির জামিনের ওপর স্থগিতাদেশটি নাকচ করে দেওয়া হবে।

মনমরা লালু

বিগত লোকসভা নির্বাচনে গো-হারান হারের পর 'ম্যাডামে'র কাছ থেকে আর বিশেষ পাত্তা পাচ্ছিলেন না তিনি। তাই বলে তো তিনি আর চুপ করে হাত গুটিয়ে থাকার মানুষ নন। তাই কারণে-অকারণে 'ম্যাডাম' ও 'রাজপুত্তুর'-কে খুশি করার জন্য যখন-তখন আর এস এস-কে গালাগালিটা দিগ্বিজয়-মনীশ-কপিলের সঙ্গে গলাগলি করে ভালই চলছিল। কিন্তু কেলো করলো খাদ্য-কেলেঙ্কারী কাণ্ডে গঠিত বিশেষ আদালত। বিশেষ আদালত গত ১৮ আগস্ট সরাসরি খারিজ করে দিল খাদ্য কেলেঙ্কারী মামলা থেকে অব্যাহতি চেয়ে বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদব এবং জগন্নাথ মিশ্রের আবেদনটিকে। তাতেই বেজায় মুষড়ে পড়েছেন লালু। কারণ দেশজুড়ে যে বিক্ষোভের ঝড় উঠেছে, তাতে এখনই বেকায়দায় থাকা কেন্দ্রীয় সরকার আর কতদিন ক্ষমতায় থাকার কায়দা বজায় রাখতে পারে সেটাই এখন দেখার। এই নিদারুণ অবস্থাতেও সরকার যখন তার সহমর্মী (পড়ুন লালু)-কেই বাঁচাতে অপারগ, তখন তাঁকে এখন বাঁচাবে কে, ভেবেই কূল পাচ্ছেন না তিনি, অর্থাৎ লালুপ্রসাদ যাদব!

পাক-হানা

এই নিয়ে গত চারদিনে তিনবার। পুঞ্চ জেলার ভারতীয় পোস্টে যুদ্ধ-বিরোধী চুক্তি ভঙ্গ করে একের পর এক গুলি চালাল পাকিস্তানী সেনা। ঘটনাটি ঘটে এমাসের মাঝামাঝি। ঘটনা'র পর যদিও ভারতীয় সেনাবাহিনী'র প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি, কিন্তু নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার স্বার্থে পাল্টা আক্রমণে যাওয়ারই পক্ষপাতী। তাঁদের যুক্তি, যুদ্ধ- বিরোধী চুক্তি কখনও একতরফা হতে পারে না। পাক-সেনা এক্ষেত্রে তাদের দায়বদ্ধতা না দেখালে, ভারতেরও তা দেখাবার প্রয়োজন নেই।

পাকে তালিবান

ওসামা বিন লাদেনের মৃত্যুর পরেও যে পাকিস্তানে তালিবানী দাপট অব্যাহত রয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে পদে পদে। সম্প্রতি গত ১৭ আগস্ট পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের অন্তর্গত অশান্ত বাজাউর জনজাতি এলাকায় জঙ্গিরা প্রকাশ্য দিবালোকে গুলি করে খুন করে অ্যান্টি- তালিবান মিলিশিয়া-র এক বরিষ্ঠ সদস্য ও তাঁর পুত্রকে। ঘটনায় কার্যত নীরব পাক-প্রশাসন এ নিয়ে উদাসীনও।

ছিটমহল সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা

একজন অনুপ্রবেশকারীও যেন ছিটমহলবাসীর ছদ্মবেশে এদেশে না থাকে

সাধন কুমার পাল

'বারতের আতিথেয়তায় আমরা অভিভূত। সীমান্ত পার হওয়ার পর থেকে প্রশাসনের লুক (লোক) থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ সবারই অমায়িক ব্যবহার। আমাদের দেশেও তো বারতের টিম গেছে তারা যে কেমন ব্যবহার পাবে সেইটাই চিন্তার।' পরিচয়ের পর প্রথম প্রতিক্রিয়ায় এই কথাগুলো প্রায় এক নিঃশ্বাসে বলে গেল বাংলাদেশি ছিটমহলে জনগণনা করতে আসা বাংলাদেশি টিমের এক সদস্য রফিকুল ইসলাম (আসল নাম নয়)। বাংলাদেশি ছিটমহলগুলোতে জনগণনার উদ্দেশ্যে চ্যাংরাবান্ধা সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশের একপ্রতিনিধি দল কোচবিহার জেলায় ঢুকছে এটা জানাই ছিল। কিন্তু গত ১৩ জুলাই সন্ধ্যাবেলা মাথাভাঙ্গার রাজস্থান সেবাসংস্থায় (মাড়োয়ারী ধর্মশালা) অন্য একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়ে হঠাৎ করে মাথাভাঙ্গা মহকুমার বাংলাদেশি ছিটমহলগুলোর জনগণনার দায়িত্বপ্রাপ্ত পুরো দলটির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে যাবে এটা ভাবিনি।

সেদিন ধর্মশালায় প্রবেশ করতে গিয়ে দেখি বেশ কিছু কম বয়সি ছেলে এদিক-ওদিক আড্ডা দিচ্ছে। চলতে চলতে একটু খটকা লাগল। একজন আরেকজনকে বলছে, 'আইচ্ছা, এইডা পচ্চিম বাংলা না। এহালে রাজস্থান সেবাসংস্থা কি কারণে?' স্বাভাবিক ভাবেই চোখ গেল প্রশ্নকর্তার দিকে। ভাষা, প্রশ্নের ধরন আর পোশাক-আশাক দেখে বোঝা গেল এরা বাংলাদেশিই হবে। কিন্তু এখানে বাংলাদেশি কেন? এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করে জানা গেল ওরা সবাই ছিটমহলের জনগণনার জন্য বাংলাদেশ সরকারের হয়ে এখানে এসেছে এবং ওদের থাকা খাওয়া সহ যাবতীয় ব্যবস্থা মাথাভাঙ্গা মহকুমা প্রশাসনের তরফে করা হয়েছে।

এই প্রতিনিধি দলের যতজনকে সামনে দেখা যাচ্ছিল এক নজরে তাদের বয়স আন্দাজ করে বেশ বোঝা যাচ্ছিল ওরা প্রায় সবাই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পরের প্রজন্মের মানুষ। সেজন্য ওদের চোখ দিয়ে ভারত ও বর্তমান বাংলাদেশ দেখার লোভ সামলানো গেল না। নিজের পরিচয় দিয়ে আড্ডা দেওয়ার সময় চেয়ে নিলাম। দু-চারজন ইতস্তত করলেও অনেকেই বেশ আগ্রহ প্রকাশ করল। সময় ঠিক হলো রাত দশটা। কারণ ততক্ষণে ওদের রাতের খাওয়া হয়ে যাবে। আড্ডার শুরুতেই ব্যক্তিগত খুঁটিনাটি। জানা গেল প্রতিনিধি দলের প্রায় সবাই বাংলাদেশের গ্রেটার রংপুর ও রাজশাহী এলাকার বাসিন্দা। কেউ সরকারি দপ্তরের চাকুরে, আবার কেউ শিক্ষকতা করেন।

সুযোগ বুঝে কিছু প্রাসঙ্গিক কথা ও তথ্য দিয়ে ওদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করা গেল। বললাম, আমাদের কোচবিহার ও আপনাদের রংপুর এলাকার মানুষের মুখের ভাষা একই। এক সময় মাথাভাঙ্গা হাইস্কুল সহ এই এলাকার সমস্ত স্কুলই রাজশাহী বোর্ডের অধীনে ছিল। আপনাদের বর্তমান ঠিকানাগুলো অর্থাৎ বাংলাদেশের রংপুর, শালমণি হাট, রাজশাহী, হাতিবান্দার মতো এলাকাগুলো এক সময় এতদ্‌অঞ্চলের অনেক মানুষেরই আদি ঠিকানা ছিল।

আমার এই ঘনিষ্ঠ হওয়ার প্রয়াস কতটা সফল হলো জানি না, তবে ওরা অনেক কথাই অকপটে বলে গেল। যেমন, ভারত মানেই আগ্রাসী শক্তি, ইসলামের শত্রু, ভবিষ্যতে বাংলাদেশকে কব্জা করে ফেলতে পারে। মুক্তিযুদ্ধে ভারত যা দিয়েছে, নিয়েছে নাকি তার থেকে অনেক বেশি, সুতরাং এই প্রতিবেশী দেশটি সম্পর্কে বাংলাদেশকে সদা-সতর্ক থাকতে হবে। ভারত সম্পর্কে এরকম একটি নেতিবাচক ভাবনার পরিমণ্ডলে তারা বেড়ে উঠেছে। তবে মিডিয়ার দৌলতে তথ্যের বিশ্বায়নের জন্যই হোক বা আওয়ামী লীগের মতো দল ক্ষমতায় থাকার জন্যই হোক, এখন নাকি সেই পরিবেশ অনেকটাই পাল্টাচ্ছে। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষও নাকি ভারতকে তাদের সহায়ক রাষ্ট্র হিসেবে ভাবতে শুরু করেছে।

ভারত সম্পর্কে ওরা এই সমস্ত কথা কতটা সৎভাবে বলেছে তা ওরাই বলতে পারবে। তবে নিজের দেশ বাংলাদেশ সম্পর্কে যা বলল তা একটি ব্যর্থ রাষ্ট্রের (ব্যর্থ রাষ্ট্রের তালিকায় বিশ্বে বাংলাদেশের স্থান ২৫তম এবং দক্ষিণ এশিয়ায় পাকিস্তান ও মায়ানমারের পরেই) নাগরিকদের মানসিকতার সঙ্গে মানানসই বলেই মনে হলো। যেমন ওরা বলছিল, বাংলাদেশিদের মধ্যে নাকি তাদের নিজের দেশের প্রতি দরদ, দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ এবং দেশপ্রেম নাকি অসম্ভব রকমের কম। নীতি নয় দুর্নীতিই নাকি ওই দেশের চালিকাশক্তি। এই দুর্নীতি নাকি ওই দেশের বেতনভুক সম্প্রদায় ও রাজনীতিবিদদের মধ্যেই বেশি। ওই দেশের বেতনভুক সম্প্রদায় এত দুর্নীতিগ্রস্ত কেন, প্রশ্ন করাতে ওরা আমাকে পাল্টা প্রশ্ন করে ভারতের সরকারি দপ্তর ও শিক্ষক-অধ্যাপকদের বেতন কাঠামো সম্পর্কে একটি ধারণা নিয়ে এর সঙ্গে বাংলাদেশের বেতন কাঠামো তুলনা করতে লাগল। এই তুলনায় দেখা গেল

কোনও রকমে ছিটমহলের মাটি আঁকড়ে ধরে থাকা মুষ্টিমেয় অত্যাচারিত প্রকৃত ছিটমহলবাসী ভারতীয়ের সঙ্গে জবর দখলকারী বাংলাদেশিরা অত্যাচারিতের ভেক ধরে ভারতীয় নাগরিকত্ব রক্ষার নামে যদি এদেশের মূলভূখণ্ডে আশ্রয় নিতে চায় তাহলে এবং সেই সংখ্যাটি যদি পঞ্চাশ হাজার থেকে এক লাখের মতো বা তার অধিক হয় তাহলে তো ভারত সরকারকে আরেকটি মরিচঝাঁপি বা জম্মুতে কাশ্মীরী উদ্বাস্তু শিবিরের মতো স্থায়ী উদ্বাস্তু শিবিরের ব্যবস্থা করতে হবে।

উত্তর-সম্পাদকীয়

বাংলাদেশের বেতন কাঠামো এতটাই কম যে একটু ভালোভাবে চলতে গেলে বেতনভুকদের নাকি বাড়তি ধান্ধা করতে হয়। এটাই নাকি দুর্নীতির অন্যতম প্রধান কারণ। শুধু বর্তমান নয় দেশের ভবিষ্যৎ নিয়েও হতাশা ঝরে পড়ছিল ওদের কথায়। বলছিল, বাংলাদেশের নাকি কোনও ভবিষ্যতই নেই। কারণ, বাংলাদেশকে নাকি কোনও দিনই ক্ষুধা-দারিদ্র্য-বেকারির ত্রিকোণ ফাঁস থেকে মুক্ত করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ১৭ জুলাই বিকেল চারটে নাগাদ আমিই ফোন করলাম ওই দলেরই এক সদস্য সইফুলকে। উচ্ছ্বাস ভরা কণ্ঠে জানাল, 'ফিল্ডে গণনার কাজে ব্যস্ত আছি'। ছিটমহলের বাংলাদেশিদের সঙ্গে কথা হচ্ছে। অনেক অভিজ্ঞতা হলো। সন্ধ্যায় কথা হবে। সেদিন রাতের খাওয়ার আগেই জমে উঠল আড্ডার আসর। ভারতের ভূমি বেষ্টিত বাংলাদেশের ছিটমহলের বাসিন্দাদের দেখে কেউ ওদের উচ্ছ্বাস গোপন করেনি। ওদের সবার বক্তব্য নির্যাস করলে যা দাঁড়ায় তা হলো, এখানকার ছিটমহলের বাসিন্দারা নামেই বাংলাদেশি, ওরা আসলে ভারতীয়ই হয়ে গেছে। বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে ওরা আর দশটা ভারতীয় নাগরিকের মতো শিক্ষা স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন সুবিধা ও সামাজিক সুরক্ষা ভোগ করে। অথচ, এখানে আসার আগে ওদের ছিটমহল সম্পর্কে ঠিক উল্টো ধারণাই ছিল। যেমন ওরা জানত ছিটমহল মানে এমন একটি জায়গা যেখানে বাংলাদেশিদের ধন-মান-সম্পত্তি এবং জীবনের কোনও মূল্য নেই। ওখানে ওরা নিরন্তর অত্যাচারিত হচ্ছে, যখন- তখন ছিটমহলের মহিলাদের ইজ্জত লুণ্ঠিত হচ্ছে। ভারতীয়রা ওদের ক্ষেতের তৈরি ফসল, গৃহপালিত পশুপাখি তুলে নিয়ে যায়, বাধা পেলে বাড়িঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। প্রশ্ন করে বোঝা গেল, নাহ্ কেবল মিডিয়া রিপোর্ট বা ভারতবিরোধী কোনও গোষ্ঠীর অপপ্রচারের জন্য ওদের মনে এরকম ভয়ঙ্কর ধারণাগুলো তৈরি হয়নি। তা হলে কি ওদের দেশে ছিটমহলগুলোর নিত্যদিনের ভয়ঙ্কর দৃশ্যের সঙ্গে তুলনামূলক ভাবনাই কি বাংলাদেশি ছিটমহল সম্পর্কে বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মের মনে এরকম হাড়হিম করা পূর্ব ধারণার জন্মদাতা? হয়তো বা তাই। এই প্রশ্নে ওরা বিব্রতবোধ করতে পারে ভেবে বিষয়টি পুরো চেপে গেলাম।

তৃতীয় দিন, ১৮ জুলাই রবিবার, প্রথম দর্শনেই একজন এগিয়ে এসে বলতে লাগল আপনি নিশ্চয়ই আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছেন। ঠিক কোন প্রশ্ন বুঝতে পারছি না দেখে আরেকজন বলল, ওই যে গতকাল প্রশ্ন করছিলেন না, এখানকার ছিটমহল সম্পর্কে কেন আমাদের মনে এক বিশ্রী পূর্বধারণা তৈরি হয়েছিল। আপনাদের উত্তরবঙ্গের সংবাদপত্র দেখে নিশ্চয়ই সেই প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছেন। সেদিনের উত্তরবঙ্গ সংবাদ তুলে ধরে একজন বলল এই খবরটি নিশ্চয়ই দেখেছেন। তাকিয়ে দেখি ছিটমহলে জনগণনা নিয়ে প্রথম পৃষ্ঠার খবর হয়েছে। তাতে একটি জায়গায় লেখা রয়েছে, 'তবে সব জায়গায় উৎসবের মেজাজ থাকলেও দু-একটি জায়গায় বাড়িঘর পোড়ানোর ঘটনা ঘটেছে। বাংলাদেশের ভিতরে থাকা ১৬নং ভারতীয় ছিটমহলে হামলা চালায় একদল দুষ্কৃতী। শুধু হামলা চালানোই নয় ছিটমহলের কয়েকটি বাড়িতে তারা নাকি আগুনও লাগিয়ে দেয়। হামলায় আতঙ্কিত গ্রামবাসীরা মেখলিগঞ্জ সীমান্তের পানিশালা গেটের কাছে এসে সাহায্যের জন্য আবেদন জানাতে থাকেন।' গতকাল ছিটমহল নিয়ে আলোচনা হওয়াতে ওরা ধরে নিয়েছিল যে বাংলাদেশে ভারতীয় ছিটমহলে হামলার খবরটি নিয়ে ওদের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। তাছাড়া দু'দিন ভারতে কাটিয়ে সবদিক থেকে ভালো ব্যবহার ও অপ্রত্যাশিত সম্মান পেয়ে এবং এদেশের ছিটমহলগুলোতে বাংলাদেশিরা ভালো আছে দেখে স্পষ্টতই বাংলাদেশে ভারতীয় ছিটমহলের বাসিন্দাদের অত্যাচারিত হওয়ার খবরে ওদের মধ্যে নিজের দেশের ব্যবস্থার প্রতি এক ধরনের ক্ষোভ ও বিরক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটে। ঠিক এ জন্যই বোধহয় সংবাদপত্রের রিপোর্ট দেখে ওদের মধ্যে এই ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়েছে।

যাইহোক ওপার বাংলার ছিটমহলগুলো সম্পর্কে ওদের প্রতিক্রিয়াগুলো সংক্ষেপে তুলে ধরলে যা দাঁড়ায় তা হলো, বৈধ নাগরিক হিসেবে সমস্ত ধরনের আইনি সুরক্ষা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ থেকে যেভাবে লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশি হিন্দু চৌদ্দ পুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে, সেখানে নাগরিকত্বহীন অসহায় ছিটমহলবাসী ভারতীয়রা এখনও ভিটেমাটি আঁকড়ে টিকে আছে এটা বোধহয় মানুষকে বিশ্বাস করানো মুস্কিল। ভারতীয় ছিটমহলগুলোর বেশির ভাগ জমি-জায়গা বাংলাদেশিরা দখল করে নিয়েছে। এই কাজটি ছিটমহল লাগোয়া প্রভাবশালী ব্যক্তিরা যেমন করেছে তেমনি করেছে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা। এই জবরদখলকারীরাই ছিটমহলগুলোতে মাথা উঁচু করে বসবাস করছে। অনেকের হাতেই এই সমস্ত দখল করা সম্পত্তির জাল দলিল আছে। দু'চার ঘর প্রকৃত ছিটমহলবাসী থাকলেও তাদের মাথা নীচু করে চোরের মতো চলতে হয়। ওদের অবস্থা অনেকটা জিওল মাছের মতো। কে যে কখন কোতল হয়ে যাবে তার ঠিক নেই। ছিটমহলের মেয়েদের নাকি কেউ বিয়ে করতে চায় না। কারণ এই সমস্ত মেয়েরা নাকি বেশির ভাগই দুষ্কৃতীদের লালসার শিকার। জোর করে জমি লিখিয়ে নেওয়া, মা-বোনেদের ইজ্জতের উপর হামলা করা, ক্ষেতের ফসল কেটে নেওয়া, মূল্যবান গাছপালা কেটে নিয়ে যাওয়া, গৃহপালিত গরু-ছাগল-হাঁস, মুরগী জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়াই নাকি ভারতীয় ছিটমহলগুলোর নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। শোনা কথার উপর ভিত্তি করে দু-একজন বলল এরশাদের জাতীয় দলের মতো কিছু রাজনৈতিক দল ভোটব্যাঙ্ক তৈরির জন্য ছিটমহলের সম্পত্তি লুট ও দখলের ঘটনায় মদত দিয়ে থাকে।

এখানে ওদের মুখের কথা বলে ছিটমহল সম্পর্কে যা লেখা হলো সেগুলো কিন্তু ওরা কেউ গুছিয়ে টানা বলে যায়নি। অনেকক্ষণ ধরে কথা বলে আড্ডার ধর্ম অনুসারে নানা প্রসঙ্গে গল্পগুজবের মাধ্যমে যে সমস্ত কথা বেরিয়ে এসেছে সেগুলোকে অর্থপূর্ণভাবে সাজানোর ফলেই ভারতীয় ছিটমহল সম্পর্কে একখণ্ড চিত্র উঠে এসেছে। এবং এটাই যদি বাংলাদেশে থাকা ভারতীয় ছিটমহলগুলোর সত্যিকারের চিত্র হয় তা হলে জনগণনার নামে ওপারে গিয়ে ছিটমহলের জবরদখলকারী বাংলাদেশিদের মাথা গুনে তাদের ভারতীয় বলে স্বীকৃতি দিয়ে ভারত সরকার যে ভবিষ্যতের জন্য আরেকটি সমস্যার আগ্নেয়গিরি সৃষ্টি করছেন এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ ভবিষ্যতে ছিটমহল বিনিময় হলে ওরা দীর্ঘ সময় ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা থেকে ব্রাত্য হয়ে থাকার জন্য ভারত সরকারের কাছে নানা রকম দাবিদাওয়া নিয়ে সরব হবে। সেই সঙ্গে কোনও রকমে ছিটমহলের মাটি আঁকড়ে ধরে থাকা মুষ্টিমেয় অত্যাচারিত প্রকৃত ছিটমহলবাসী ভারতীয়ের সঙ্গে জবর দখলকারী বাংলাদেশিরা অত্যাচারিতের ভেক ধরে ভারতীয় নাগরিকত্ব রক্ষার নামে যদি এদেশের মূলভূখণ্ডে আশ্রয় নিতে চায় তাহলে এবং সেই সংখ্যাটি যদি পঞ্চাশ হাজার থেকে এক লাখের মতো বা তার অধিক হয় তাহলে তো ভারত সরকারকে আরেকটি মরিচঝাঁপি বা জম্মুতে কাশ্মীরী উদ্বাস্তু শিবিরের মতো স্থায়ী উদ্বাস্তু শিবিরের ব্যবস্থা করতে হবে। ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক যে ভাবে ক্রমশঃই উষ্ণ হয়ে উঠছে তাতে হয়তো অচিরেই ছিটমহল সমস্যার বরফ গলবে। কিন্তু তার আগে বোধহয় বাংলাদেশ ঘেরা ভারতীয় ছিটমহল থেকে সর্বস্ব হারিয়ে প্রত্যক্ষ মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচতে যে মানুষগুলো উদ্বাস্তু হয়ে এদেশের পথে প্রান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে এটাও নিশ্চিত করা প্রয়োজন যে ছিটমহল বিনিময় হলে ছিটমহলবাসীর ছদ্মবেশে একজন বাংলাদেশিও যাতে এদেশে প্রবেশ করতে না পারে। অর্থাৎ ছিটমহল বিনিময়োত্তর সব ধরনের সম্ভাব্য পরিস্থিতি গিয়ে গভীর ভাবে ভাবনা-চিন্তার প্রয়োজন আছে। সময়ের নিয়মে এক সময় আড্ডা শেষ হলো। কিন্তু ছিটমহলে জনগণনার সরকারি কাজ করতে এসে ওরা বোধহয় একটি দাগ রেখে গেল। এই লেখাটিই এ কথার বড় প্রমাণ।

প্রস্তাবিত কম্যুনাল অ্যাণ্ড ভায়োলেন্স বিল

একটি বিপজ্জনক খসড়া

অতিথি কলম

অরুণ জেটলি

''Prevention of Communal and Targeted Violence (Access to Justice and Reparations) Bill, 2011''—প্রস্তাবিত এই বিলের খসড়া জনসমক্ষে রাখা হয়েছে। আপাতভাবে এই খসড়াটি দেশে সাম্প্রদায়িক হিংসা থামানো ও অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার চেষ্টা বলে মনে হবে। যদিও সেটি আপাত লক্ষ্য হলেও প্রস্তাবিত আইনের আসল উদ্দেশ্য একেবারেই বিপরীত। এই বিলটি যদি আইন হিসাবে কার্যকর হয়, তাহলে রাজ্যের এক্তিয়ারে প্রবেশ করবে। ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো নষ্ট করবে এবং দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্কের ভারসাম্যে বিঘ্ন ঘটাবে।

এই বিলটি আদপে কী করবে—

এই বিলের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হলো গোষ্ঠীর (Group) অর্থ। এই গোষ্ঠী মানে ধর্মীয় ও ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘু এবং তফসিলি জাতি ও উপজাতিকে অন্তর্ভুক্ত করা। এর দ্বিতীয় অধ্যায়ে একগুচ্ছ নতুন অপরাধের ব্যাখ্যা তৈরি করা হয়েছে। ষষ্ঠ ধারায় স্পষ্ট করা হয়েছে, এই বিলে অপরাধ 'SC & ST (Prevention of Atrocities) Act, 1989'-এর অধীনে অপরাধের অতিরিক্ত হবে। কোনও এক ব্যক্তিকে কি একই অপরাধের জন্য দু'বার শাস্তি দেওয়া যায়? সপ্তম ধারায় বলা হয়েছে, কোনও ব্যক্তি যৌন অত্যাচার করেছেন, সেটি নির্ধারণ হবে কোনও 'গোষ্ঠী'র কোনও ব্যক্তির সঙ্গে যদি যৌন আচরণ করা হয়। অষ্টম ধারা বলছে, 'ঘৃণা প্রচার' তখনই অপরাধ বলে গণ্য হবে, যখন মৌখিক বা লিখিত বা প্রকাশ্যে পরিলক্ষিত কোনও ঘৃণা কোনও 'গোষ্ঠী' বা কোনও 'গোষ্ঠী'ভুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে করা হচ্ছে। নবম ধারায় সাম্প্রদায়িক এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্যে হিংসার অপরাধ তৈরি করা হয়েছে। কোনও ব্যক্তি এককভাবে কিংবা যৌথভাবে কিংবা অনৈতিক কাজে লিপ্ত এমন কারও দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কোনও 'গোষ্ঠী'র বিরুদ্ধে কাজ করছে, তাহলে সংগঠিত সাম্প্রদায়িক ও নির্দিষ্ট লক্ষ্যে হিংসা ছড়ানোর দায়ে দোষী বিবেচিত হবে। দশম ধারায় বলা হয়েছে, কোনও 'গোষ্ঠী'র বিরুদ্ধে অপরাধের জন্য অর্থ খরচ বা সরবরাহ বা সমর্থন যোগানোর জন্য শাস্তির ব্যবস্থা থাকবে। কোনও আমলা যদি মানসিক বা শারীরিক ভাবে কোনও 'গোষ্ঠী'ভুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যন্ত্রণা বা কষ্ট দেন, তাহলে দ্বাদশ ধারায় সেটিকে অত্যাচারের অপরাধ বলে গণ্য করা হবে। বিলে এই অপরাধের জন্য ত্রয়োদশ ধারায় কোনও আমলাকে কর্তব্যের গাফিলতির জন্য শাস্তি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। চতুর্দশ ধারায় বলা হয়েছে, যে অফিসার সশস্ত্র বাহিনী ও নিরাপত্তা বাহিনী নিয়ন্ত্রণ করছেন অথচ জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হবেন ও ঠিকভাবে নিজের কর্তব্য করতে ব্যর্থ হবেন, তাঁদের শাস্তি দেওয়া হবে। পঞ্চদশ ধারায় বিস্তারিত দায়ের নীতিও আরও প্রসারিত করা হচ্ছে। কোনও অ্যাসোসিয়েশনের পদাধিকারী কিংবা প্রবীণ ব্যক্তি যদি তাঁর অধীনে অধস্তন বা তাঁর তত্ত্বাবধানে বা নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এমন ব্যক্তিদের নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে সেটিও অপরাধ বলে ধরা হবে। আশ্চর্যজনক ভাবে তাঁকেও দায়ী করা হবে, যখন অপরাধ আসলে অন্য কোনও ব্যক্তি করছেন। ষোড়শ ধারায় বলা হয়েছে, এই ক্ষেত্রে কোনও অপরাধ হলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না।

কোনও সাম্প্রদায়িক সমস্যার সময় অপরাধ হলে সেটি আইন-শৃঙ্খলার সমস্যা বলে বিবেচিত হয়। আর আইন-শৃঙ্খলার বিষয়টি রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত। কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা বিভাজনের নিরিখে আইন- শৃঙ্খলার বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সরাসরি কোনও এক্তিয়ার নেই। কেন্দ্রীয় সরকারের সরাসরি এই বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করার কোনও অধিকার নেই, এই বিষয়ে কোনও আইনও প্রণয়ন করতে পারে না। কেন্দ্রীয় সরকার শুধুমাত্র উপদেশ, নির্দেশ এবং সংবিধানের আওতায় রাজ্য কাজ করছে কি না, সেই বিষয়টি বিবেচনা করে ৩৫৬ ধারার অধীনে মত গঠন করতে পারে। প্রস্তাবিত এই বিলটি যদি আইন হয়, তাহলে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের অধিকার অধিগ্রহণ করবে এবং এমন একটি বিষয়ে আইন প্রণয়ন করবে যেটি একমাত্র রাজ্যেরই এক্তিয়ারে রয়েছে।

ভারত ধীরে ধীরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে আরও সুসম্পর্কের পথে হাঁটছে। এমনকী এখন যখন সামান্য সাম্প্রদায়িক ও জাতিগত সমস্যা দেখা যায়, তা সত্ত্বেও জাতীয় মনোভাব তার বিরুদ্ধে। সরকার, সংবাদমাধ্যম, আদালত, আরও প্রতিষ্ঠানগুলি এ ব্যাপারে তাদের কর্তব্য পালন করতে সক্রিয়। সাম্প্রদায়িক সমস্যার জন্য যারা প্ররোচনা দেয়, তাদের নিশ্চিতভাবে শাস্তি দেওয়া উচিত। কিন্তু খসড়া বিলটি ধরেই নিয়েছে, সাম্প্রদায়িক সমস্যা শুধুমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ই তৈরি করে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যরা কখনওই সেটি করে না। তার ফলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যদের বিরুদ্ধে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সদস্যদের অপরাধ শাস্তিযোগ্য। অথচ সংখ্যাগরিষ্ঠের উপর সংখ্যালঘুদের সমান অপরাধ কোনও ভাবেই অপরাধ বলে গণ্য নয়। সেই হিসাবে এই বিলে যৌন অপরাধও শাস্তির যোগ্য বলে গণ্য হবে, যখন শুধুমাত্র সেটি সংখ্যালঘু 'গোষ্ঠী'র আওতায় আসে না। কোনও 'ঘৃণার প্রচার' তখনই অপরাধ যখন সেটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে হচ্ছে, অন্যথা নয়। সংগঠিত ও নির্দিষ্ট লক্ষ্যে হিংসা ছড়ানো, অত্যাচার, আমলাদের কর্তব্যে গাফিলতি— এই সবকিছুই অপরাধ হবে যখন সেটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যের বিরুদ্ধে হবে, অন্যথা নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের কোনও সদস্য কখনওই আক্রান্ত হতে পারে না। খসড়া আইনটি তাই অনেক কিছু অনুমান করে নিয়েছে ও অপরাধের নতুন সংজ্ঞা প্রচণ্ড বৈষম্যের ভিত্তিতে করা হয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অপরাধ করেও তাই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোনও সদস্য এই আইনের আওতায় শাস্তি পাবে না। সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সদস্যেরই শুধু এ ধরনের অপরাধের প্রবণতা রয়েছে, তাই আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়কেই দায়ী করা ও তাদের শাস্তি দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা। এই বিল যদি রূপায়িত হয়, তাহলে এর অপব্যবহারের বিপুল সুযোগ সৃষ্টি হবে। এটি কিছু সম্প্রদায়ের সদস্যদের এ ধরনের অপরাধ করতে উৎসাহিত করবে, কারণ তাদের কখনওই এই আইনের আওতায় অভিযুক্ত করা হবে না। সন্ত্রাসবাদী সংগঠনও আর সন্ত্রাসের হিংসা ছড়াবে না। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়াতে তাদের উৎসাহিত করা হবে, কারণ এই আইনের আওতায় জিহাদি গোষ্ঠীর কোনও সদস্যকে শাস্তি দেওয়া হবে না

এটা বিধিবদ্ধভাবে ধরেই নেওয়া হয়েছে। আইন বলছে শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সদস্যরাই দোষী। ধর্ম ও জাতের ভিত্তিতে আইনে কেন বৈষম্য করা হবে? অপরাধ যে কোনও ভাবেই অপরাধ। অপরাধীর পরিচয় ছাড়াই। আর একবিংশ শতাব্দীতে এমন এক আইন প্রস্তাবিত করা হচ্ছে, যেখানে আইনের আওতায় অপরাধকে ধুয়ে মুছে অপরাধীর জাত ও ধর্মকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

এই আইনের রূপায়ণ কে সুনিশ্চিত করবেন?

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, ন্যায় ও ক্ষতিপূরণের জন্য সাত সদস্যের একটি জাতীয় কর্তৃপক্ষ গঠনের কথা বিলে বলা হয়েছে। এই সাত সদস্যের মধ্যে চারজন সেই 'গোষ্ঠী'র হবেন। অর্থাৎ, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। তারমধ্যে চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যানও রয়েছেন। রাজ্যে-রাজ্যেও এ ধরনের একটি কর্তৃপক্ষ গঠনের কথা বলা হচ্ছে। এই কর্তৃপক্ষের সদস্যও সে ক্ষেত্রে হচ্ছে জাতি ও ধর্মের ভিত্তিতে। এই আইনে অপরাধী শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের। আর এই আইন প্রয়োগ করবে এমন এক কর্তৃপক্ষ, যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সদস্যরা আসলে সংখ্যালঘু। সরকার পুলিশ ও অন্য তদন্তকারী সংস্থাকে দিয়ে এই কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করবে। এই কর্তৃপক্ষের হাতে ক্ষমতা থাকবে তদন্ত করার জন্য। কোনও বাড়িতে ঢুকে, হানা দিয়ে, তদন্তকে অভিযোগ হিসাবে তুলে ধরার জন্য সরেজমিনে খতিয়ে দেখা, শুনানির প্রক্রিয়া রেকর্ড করা, অন্যান্য পদক্ষেপ শুরু করা, সরকারকে সুপারিশ করার ক্ষমতাও থাকবে তাঁদের হাতে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারকে উপদেশ পাঠানোর ক্ষমতাও থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই কর্তৃপক্ষের সদস্য নিয়োগের ক্ষেত্রে একটি কলেজিয়াম গঠন করা হবে। তাতে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, লোকসভার বিরোধী দলনেতা এবং সব স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের নেতারা থাকবেন। ঠিক এ ভাবে রাজ্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। সেই হিসাবে কেন্দ্র ও রাজ্যে এই কর্তৃপক্ষ গঠনের ক্ষেত্রে বিরোধীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ মত থাকবে।

কি প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হবে?—

এই আইনের আওতায় তদন্তের প্রক্রিয়া পালনের ক্ষেত্রে একটি অস্বাভাবিক পথ অনুসরণ করা হবে। সিআরপিসি-র ১৬১ ধারার অধীনে কোনও বয়ান নথিভুক্ত করা হবে না। আক্রান্তের বয়ান শুধুমাত্র আদালতের সামনে ১৬৪ ধারায় নেওয়া হবে। মেসেজ ও টেলিযোগাযোগ ব্লক করা ও সেটি আড়ি পেতে শোনার অধিকার থাকবে সরকারের হাতে। এই বিলের ৭৪ নং ধারা অনুযায়ী ঘৃণার প্রচারের ক্ষেত্রে কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে যদি অভিযোগ ওঠে, তাহলে সেটি অপরাধ বলে ধরে নেওয়া হবে যদি না অপরাধী উল্টোটা প্রমাণ করতে পারেন। যার ফলে শুধু অভিযোগই প্রমাণের সমতুল বলে ধরা হবে। রাজ্যের অনুমতি ছাড়াই এই বিলের ৬৭ ধারায় আমলাদের বিরুদ্ধে প্রক্রিয়া শুরু করার কথা বলা হয়েছে। স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটার এই আইনের আওতায় সত্যের ভিত্তিতে নয়, 'আক্রান্তের স্বার্থে' প্রক্রিয়া করবেন। আক্রান্ত অভিযোগকারীর নাম ও পরিচয় গোপন রাখা হবে। যে আক্রান্ত অভিযোগ করেছেন, তাঁকে মামলার অগ্রগতির ব্যাপারে পুলিশ জানাতে থাকবে। এই আইনে সংগঠিত সাম্প্রদায়িক ও নির্দিষ্ট লক্ষ্যে হিংসা সে রাজ্যে অভ্যন্তরীণ সমস্যা বলে গণ্য হতে পারে সংবিধানের ৩৫৫ ধারার অধীনে, যার ফলে কেন্দ্র রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করতে পারে।

এই বিলের খসড়া সেই সব সামাজিক উদ্যোগীদের কাজ বলে মনে হচ্ছে, যাঁরা গুজরাতের অভিজ্ঞতা থেকে শিখেছেন অপরাধের যোগ্য না হলেও প্রবীণ নেতাদের কি করে দায়ী করা যায়।

এই বিলে অপরাধের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, সেটি ইচ্ছা করেই ধোঁয়াশায় রাখা হয়েছে। সাম্প্রদায়িক ও নির্দিষ্ট লক্ষ্যে হিংসা মানে এমন এক হিংসা যেটি 'দেশের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র'কে হনন করে। ধর্মনিরপেক্ষ বলতে কি বোঝায়, তা নিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই রাজনৈতিক মতান্তর হতে পারে। 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটি বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন। বিচারপতি কোন সংজ্ঞাকে অনুসরণ করবেন? একইভাবে বিরূপ 'পরিবেশ' তৈরি করাও ব্যক্তিবিশেষ সিদ্ধান্তের উপরে নির্ভরশীল। কাকে 'বিরূপ পরিবেশ' বলে?

এ ধরনের আইনের সরাসরি ফল হল, কোনও সাম্প্রদায়িক সমস্যা হলেই সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়কে দোষী ধরে নেওয়া হবে। যদি না বিপরীত ঘটনা প্রমাণ করা যায় তাহলে দোষকে আগেভাগেই ধরে নেওয়া হচ্ছে। শুধুমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজের সদস্যকেই এই আইনের আওতায় দোষী ধরা হবে। কেন্দ্র ও রাজ্য স্তরে যে বিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ গঠন করা হবে, সেগুলি অবধারিত ভাবে পক্ষপাতিত্বের শিকার হবে। কারণ, সেটির সদস্য জাতি ও সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে করা হচ্ছে।

আমার কোনও সন্দেহ নেই, যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই খসড়া করা হয়েছে, সেই আইন রূপায়িত হলে ভারতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সম্পর্কের মধ্যে সম্প্রীতি ক্ষুণ্ণ হবে। এই আইন বিপজ্জনক পরিণতির ভারে ভারাক্রান্ত। এর অপব্যবহার হওয়া অবধারিত। সম্ভবত, এই খসড়া তৈরির পিছনে এটিই আসল উদ্দেশ্য। এর ফলে সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়িকতা আরও উৎসাহিত হবে। এই আইন সাম্যতা ও সুষ্ঠুতার মৌলিক নীতিকে উপেক্ষা করেছে। জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদের সামাজিক উদ্যোগীরা এ ধরনের বিপজ্জনক ও বৈষম্যে ভরা আইনের খসড়া বানাতে পারেন। বিস্ময় হয়, এই পরিষদের রাজনৈতিক প্রধান কী করে এই খসড়ার ছাড়পত্র দিলেন। যখন কিছু ব্যক্তি সন্ত্রাসবাদ বিরোধী আইন 'টাডা'র বিরুদ্ধে প্রচার করছিলেন, ইউ পি এ-র সদস্যরা যুক্তি দিয়েছিলেন এমনকী সন্ত্রাসবাদীদেরও স্বাভাবিক আইনের আওতায় শুনানি হওয়া উচিত। তার থেকেও অতিশয় কঠোর ও নির্মম একটি আইন এখন প্রস্তাব করা হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় সরকার যখন তাদের দুর্ভাগ্যজনক লক্ষ্য নিয়ে এগোতে থাকবে, তখন অসহায় দৃষ্টিতে বসে থাকা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকবে না রাজ্য সরকারের। তাদের ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হবে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সন্ধান সুষ্ঠুভাবে আসুক, বিপরীতগামী বৈষম্যের পথে নয়।

সোনিয়ার নেতৃত্বাধীন 'এন এ সি' দেশভাগ করতে চাইছে

রাকেশ সিন্‌হা

বিলটির নাম 'প্রিভেনশন্ অফ্ কম্যুনাল অ্যান্ড টারগেটেড ভায়োলেন্স বিল-২০১১'। সোনিয়া গান্ধীর সভানেতৃত্বে 'ন্যাশন্যাল অ্যাডভাইসারি কাউন্সিল' ওই বিলটির খসড়া তৈরি করেছে। বলা বাহুল্য এই 'এন এ সি' একটি সংবিধান বহির্ভূত সংস্থা (Extra Constitutional) মাত্র। আদতে মূল উদ্দেশ্য হলো ইউ পি এ সরকারের উপর খবরদারি করা বা নির্দেশ দিয়ে তা করতে বাধ্য করা। ডঃ মনমোহন সিং-এর মতো দুর্বল প্রধানমন্ত্রী তা করেও থাকেন। কেননা সোনিয়াজী একাধারে 'ইউ পি এ'-এর চেয়ারপার্সন, কংগ্রেস দলের সভানেত্রীও বটেন।

এই খসড়া বিল আইনে রূপান্তরিত হলে তা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সমাজ ও দেশের সর্বমান্য প্রয়াত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ দেশপ্রেমিক নেতৃত্বকে কী দুরবস্থায় টেনে নিয়ে যেতে পারে তা কল্পনা করলেও শিউরে উঠতে হবে।

এসবই মুসলিম তুষ্টিকরণ সংখ্যালঘু তুষ্টিকরণের চূড়ান্ত উদাহরণ। যাঁরাই ওই বিলের ভয়ঙ্কর খসড়াটি (ড্রেঞ্জারাস ড্রাফ্ট) দেখেছেন, তাঁদের সঙ্গে এই বিলের ফলে প্রয়াত জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক নেতৃবৃন্দ— বালগঙ্গাধর তিলক, মহর্ষি অরবিন্দ, লালা লাজপত রায়, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর মতো ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা যেতে পারে। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানোর দায় থেকে রেহাই পাবেন না সমাজবাদী নেতা আচার্য কৃপালনী, মার্কস্‌বাদী বি টি রণদিভে, সর্বোদয় নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণের মতো বিশিষ্ট জনদের বিরুদ্ধে তাঁদের লিখিত প্রবন্ধ এবং প্রকাশিত ভাষণের উপর নিষেধাজ্ঞা লাগিয়ে মরণোত্তর মামলা দায়ের করা যেতে পারে। এটা কোনও অতিরঞ্জিত অতিশয়োক্তি নয়, কঠিন সত্য ও বাস্তব। ১৯৪৬ সালেই মুসলিম লীগ জয়প্রকাশ নারায়ণের উপরে বন্যাত্রাণ ও খরাত্রাণে সহায়তা নিয়ে হিন্দুদের মুসলমানদের বিরুদ্ধে উস্কানি দেওয়ার অভিযোগ করেছিল। কেরলের মার্কসবাদী সরকার ১৯৫০-এর দশকেই নতুন শিক্ষানীতি চালু করেছিল। তখনই খৃস্টানরা জোরদার বিরোধিতা করেছিল। তখন কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক বি টি রণদিভে ক্যাথলিকদের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির এজেন্ট বলে বিদেশী অর্থের অসদুপযোগের অভিযোগ করেছিলেন। আচার্য কৃপালনীর এক ভাইকে মুসলমান করা হয়েছিল। সে আবার অন্য এক ভাইকে অপহরণ করে তাকে জোরজবরদস্তি করে মুসলমান করেছিল। তখন আচার্য কৃপালনীও ইসলামের সমালোচনা করে বলেছিলেন, ইসলাম ব্যক্তিকে নিষ্ঠুর তৈরি করে, ব্যক্তির মধ্যে ইসলামের প্রতি অন্ধ অনুরাগ নির্মাণ করে। এরকম সব ঘটনাই দণ্ডযোগ্য অপরাধ হিসেবে আইন-বলে গণ্য হবে, যদি প্রস্তাবিত 'প্রিভেনশন অফ্ কম্যুনাল অ্যান্ড টার্গেটেড ভায়োলেন্স বিল-২০১১' আইনে পরিণত হয়।

বিষে ভরপুর খসড়া

এই খসড়াটি একটু তলিয়ে দেখলেই উপরোক্ত বক্তব্যের অনেক বেশী গভীর ষড়যন্ত্র দেখা যায়। এই বিলের মধ্যে মোট নয়টি অধ্যায় এবং ১৩৮টি ধারা রয়েছে। মজার কথা হলো, এই আইন কেন আনা হচ্ছে, এই উদ্দেশ্য কি— এ ব্যাপারে কোনও কথাই নেই। অর্থাৎ কোনও প্রস্তাবনা বা মুখবন্ধ নেই। প্রথম অধ্যায়ে কিছু শব্দবন্ধকে পরিভাষিত করা হয়েছে মাত্র। ওই পরিভাষা বা সংজ্ঞা দেশের সংবিধান, সমাজ এবং শাসনব্যবস্থাকেই ছারখার করে দেবে। এমনকী দেশের জনসমুদায়কে দুটি পরস্পর শত্রুতাপূর্ণ শিবিরে পরিণত করে দিতে সক্ষম। একদিকে পন্থ, ভাষাগত সংখ্যালঘু এবং তপশিলি জাতি ও জনজাতিদেরকে রাখা হয়েছে। এদেরকে বলা হয়েছে 'গ্রুপ'। আমাদের দেশে তপশিলি জাতি ও জনজাতিদের জন্য আলাদা কমিশন এবং আইন-কানুন রয়েছে। সর্বত্র অল্পসংখ্যকদের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে আসল মনোভাবটা আড়াল করা যায়। এর আগে 'সাচার কমিটির' সুপারিশের ভিত্তিতে সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রকের দ্বারা 'সমান সুযোগ-সুবিধাবিষয়ক আইন'-এ তপশিলি জাতিদেরকেও রাখা হয়েছে। ভাষাগত সংখ্যালঘুদের বিষয়টা বিশদে ব্যাখ্যা করা হয়েছে রঙ্গনাথ মিশ্র কমিশনের রিপোর্টে। ভাষাগত এবং

ধর্মমতগত জাতীয় কমিশন-এর অস্তিত্বের সঙ্কট দেখা দিয়েছে। এর ফলে, 'গ্রুপ' মানে এখন মূলত মুসলমান এবং খৃস্টানদেরকেই বেশি করে নির্দেশ করে। গ্রুপের বাইরে সকলের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে 'অন্য'।

ভারতবর্ষের তাবৎ জনসাধারণকে দুটি পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন শিবিরে বিভক্ত করার পর 'সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা', 'বলাৎকার' এবং 'বিদ্বেষপূর্ণ ব্যবহার' প্রভৃতি শব্দকে পরিভাষিত করা হয়েছে। সেখানে দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক হিংসাত্মক আচরণকেই 'দাঙ্গা' বলে ধরে নেওয়া হবে। প্রস্তাবিত আইনে কেবলমাত্র 'গ্রুপ'-এর লোকেদের ক্ষেত্রেই জান-মাল (জীবন ও সম্পত্তির)-এর যে কোনওরকম ক্ষতিকেই সাম্প্রদায়িক এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হিংসা বলে ধরে নেওয়া হবে। যদি হিন্দুদের জীবন ও সম্পত্তির কোনওরকম ক্ষতি সংখ্যালঘুরা করে থাকে তাকে কিন্তু সাম্প্রদায়িক এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হিংসা বলে স্বীকার করাই হবে না (ধারা ৩-সি দ্রষ্টব্য)। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোনও ব্যক্তির ব্যবসা-বাণিজ্য অথবা জীবিকায় বাধা সৃষ্টি করলে অথবা সার্বজনিকভাবে (প্রকাশ্যে) অপমান করলে তা শত্রুতাপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি বলে গণ্য করা হবে। এক্ষেত্রে যদি কোনও হিন্দু হিংসার ফলে মারা যায়, আহত হয়, তার সম্পত্তি নষ্ট হয়, অপমানিত হয় বা ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদও করা হয় তবুও আইনে তাকে উৎপীড়িত বলে মানা হবে না। এসব ক্ষেত্রে তাকেই পীড়িত বলে গণ্য করা হবে যে ব্যক্তি ওই গ্রুপের সদস্য। যদি কোনও হিন্দু মহিলা সংখ্যালঘুদের হাতে ধর্ষিতাও হয় তবুও আইন তাকে বলাৎকার বা ধর্ষণের অপরাধ বলে মানবে না। আইনের ৭নং ধারা অনুসারে পূর্বকথিত গ্রুপের কোনও মহিলা যদি গ্রুপের বাইরের কারও দ্বারা একইরকম ঘটনার শিকার হন তাহলে কিন্তু তা বলাৎকার-এর অপরাধ বলে গণ্য হবে। আবার গ্রুপের মধ্যেকার ব্যক্তি দ্বারা ধর্ষিতা হলে তা ধর্ষণ বলে মানা হবে না। অর্থাৎ 'ইমরানা'র (উত্তরপ্রদেশের ঘটনা) শ্বশুর ইমরানাকে বলাৎকার করলে তা বলাৎকার নয়।

বিচার-বিতর্কের বাইরে

এখানে 'সাক্ষী'র নতুন পরিভাষা দেওয়া হয়েছে। সংখ্যালঘুদের সঙ্গে ঘটিত ঘটনার বিষয়ে যে জানে সেই 'সাক্ষী'। সংখ্যাগরিষ্ঠদের বিষয়ে যে জানে সে 'সাক্ষী' হতে পারবে না। 'অপপ্রচার-কে দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৮নং ধারায় এমনভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যে, লালা লাজপত রায়, বালগঙ্গাধর তিলক এবং বিপিনচন্দ্র পাল-এর মতো মহান চিন্তাবিদদের রচনাও নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। পন্থনিরপেক্ষতার বিষয়ে বৈকল্পিক বিতর্কের আর সুযোগই থাকবে না। কেউই বাইবেল, কোরাণ, মুসলিম পার্সোন্যাল 'ল, ইসলাম রীতি-কুরীতি, সংখ্যালঘুদের দাবী-দাওয়া, আন্দোলন, সংগঠন বিষয়ে কোনওরকম টীকাটিপ্পনী, বিতর্ক-আলাপ-আলোচনা করতে পারবেন না। যদি কোনও অন্য ব্যক্তি অর্থাৎ হিন্দু লিখিত ভাবে বা বিজ্ঞাপন দিয়ে, খবরাখবর দিয়ে ওরকম কিছু করে তাহলেই তাকে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে উসকানি দেওয়া বলে ধরে নেওয়া হবে এবং তাকে মিথ্যাপ্রচার ও ঘৃণা ছড়ানোর অপরাধে দোষী বলে মানা হবে। তথাকথিত ঐতিহাসিক মুশিরুল হাসানই তো 'লাল-বাল-পাল' অর্থাৎ লালা লাজপৎ রায়-বালগঙ্গাধর তিলক-বিপিনচন্দ্র পাল-কে সংখ্যালঘুদেরকে স্বাধীনতা আন্দোলনে কোণঠাসা ও নিক্ষিপ্ত করার জন্য দায়ী করেছেন। অর্থাৎ এবার থেকে ওই তিন ব্যক্তির লেখা, বক্তৃতা প্রকাশ করা বা উদ্ধৃত করা হলে তাকে জেলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আইনে কোনও কিছুই বাকী রাখা হয়নি। হিন্দু সংগঠনকেও কিরকম সুচতুরভাবে নিশানা করা হয়েছে! যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজের কেউ সংখ্যালঘুদের প্রতি উপরোক্ত কোনওরকম অপরাধে দোষী হয় তাহলে তিনি যে সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত সেই সংস্থার প্রধানের বিরুদ্ধে দণ্ডসংহিতা অনুসারে অপরাধমূলক আইন প্রয়োগ করা হবে। অথচ সংগঠন প্রধানের তার সঙ্গে কোনওরকম প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগাযোগ নেই। সংগঠন নথিভুক্ত হোক বা না হোক তাতে কিছু যায় আসে না। মনে করুন, কোনও গ্রাম বা শহরে ক্লাব বা রামলীলা কমিটি আছে। তাদের কোনও সদস্য কোনও এক সংখ্যালঘুকে গালি দিল, বহিষ্কার করল, ব্যবসাতে পরস্পর ঝগড়া করল— তাহলে সেই ক্লাব বা রামলীলা কমিটির পদাধিকারীদের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক মামলা চালু হবে। ব্যবসাবাণিজ্য ও রুজি-রোজগারের ক্ষেত্রে এই আইন পরস্পর নির্ভরশীলতা, বিশ্বাসযোগ্যতাকে একেবারে শেষ করে দেবে। রাষ্ট্রের মধ্যেই অঘোষিতভাবে এক সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রের সৃষ্টি হবে ওই প্রস্তাবিত আইন পাস হলে।

হিন্দুরাই অপরাধী হবে

বাঁচার একটাই পথ অবশিষ্ট থাকবে। আর তা হলো ভারতবর্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমাজ (হিন্দু) যদি সংখ্যালঘুদের চাওয়া-পাওয়া, ইচ্ছা- অনিচ্ছা, ভালো লাগা-মন্দ লাগার কথা আগে থেকে ভেবে নিয়ে তাদের ক্রীতদাসের মতো চিন্তা-ভাবনা ও আচার আচরণ করে। যদি কোনও সংখ্যালঘু সংখ্যাগরিষ্ঠ (হিন্দু) সমাজের কারও কাছে টাকা পয়সা, চাকরি- বাকরি, ঘর ভাড়া প্রভৃতি চায় তাহলে যদি তার যোগ্যতার বা সুবিধা ভেবে না দেওয়া হয় তাহলে সেই হিন্দু দণ্ডবিধির অধীনে অপরাধী সাব্যস্ত হবেন। আবার যদি শিয়া-সুন্নীতে, খৃস্টান-মুসলমান-এ কোনও ঝামেলা হয়, সেক্ষেত্রে ওই আইন আদৌ প্রযোজ্য হবে না। আদতে ওদেরকে দাঙ্গা করার তথাকথিত বিশেষাধিকার দেওয়া হচ্ছে। তপশিলি জাতি ও জনজাতিদেরকে সংখ্যালঘুদের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার পিছনেও জটিল কুটিল মনোভাব রয়েছে। যদি আপনি (কোনও হিন্দু) খৃস্টান মিশনারীদের ছল-বল-কৌশলে সুপরিকল্পিত ধর্মান্তরকরণ, ইসলামিক পেট্রোডলারের অপব্যবহারের ব্যাপারে অভিযোগ করেন, সত্যকে প্রকাশ করার দুঃসাহস করেন তাহলে আপনার বিরুদ্ধেও দণ্ডবিধি প্রযোজ্য হবে। আরও একটি কথা এক্ষেত্রে সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। আদালতের রায়ে অপরাধী প্রমাণ হবার আগেই তাদের (হিন্দুদের) কপালে অপরাধীর সীলমোহর পড়ে যাবে। প্রত্যেক অভিযুক্তকেই প্রমাণের আগেই অপরাধী বলে গণ্য করা হবে— অভিযুক্তকেই প্রমাণ করতে হবে তিনি অভিযুক্ত নন।

পুলিশ এবং আমলাদেরকেও সংখ্যালঘুদের দয়া-দাক্ষিণ্যের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কোথাও যদি সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে কোনওরকম অপপ্রচার, বিদ্বেষমূলক পরিবেশ তৈরি হয়, কোনও বিরুদ্ধে পোস্টার সাঁটা হয়। প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোনও ব্যক্তির জীবন বা সম্পত্তির কোনওরকম ক্ষতি হয় তাহলে পুলিশ-প্রশাসনকে দায়ী করা হবে। তাদের উপরেও অপরাধমূলক মামলা চলবে। তাদের বাঁচার একটাই রাস্তা—খবর তা হলো, কিছু ঘটুক বা না ঘটুক কোথাও এরকম কোনও আশঙ্কা দেখা দিলেই হিন্দুদেরকে আগেভাগেই গ্রেপ্তার করতে থাকা। হিন্দুদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার, দেব-দেবীর অপমান অথবা তাদের জীবন-সম্পত্তির যতই ক্ষতি হোক না কেন পুলিশকে এবং প্রশাসনকে সেজন্য কোনওরকম বিচলিত হওয়ার কোনও কারণ নেই।

এই প্রস্তাবিত আইনে দু'ধরনের দণ্ডবিধির ব্যবস্থা রয়েছে। এতদিন পর্যন্ত মুসলমানদের কাছে কেবলমাত্র 'পার্সোন্যাল ল' ছিল। এবার আলাদা দণ্ডবিধি (পেনাল কোডও) তাদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। এই আইনের খসড়াতে একটাই উদ্দেশ্য দেখা যাচ্ছে— এক দেশে দুরকম আইনই নয়, দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে বিনষ্ট করার ব্যবস্থা হচ্ছে। যে কোনও রাজ্যে সাম্প্রদায়িক গণ্ডগোলকে 'অভ্যন্তরীণ গোলমাল' আখ্যায় ভূষিত করে সংবিধানের ৩৫৫ ধারার অন্তর্গত কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ অনিবার্য বা আবশ্যিক করার বন্দোবস্ত হচ্ছে। এটাকে আইনের নামে পুরো সংবিধানকে ওলোটপালট করা ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে? জাতীয় স্তরে এবং রাজ্যস্তরে এজন্য 'কমিশন' বানানোর ব্যবস্থা আছে। এই কমিশনের সাতজন সদস্যের চারজনের সংখ্যালঘু হওয়া বাধ্যতামূলক। তাদের আওতায় পুলিশ, প্রশাসন এবং বিচারবিভাগের কাজে হস্তক্ষেপ এবং নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। অভিযুক্ত ব্যক্তি (প্রমাণের আগেই) পুলিশ, প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তি অথবা হিন্দু হলেই তাকে 'অপরাধী' বলেই ধরে নেওয়া হবে। খসড়া আইনের ৫৮, ৭৬ এবং ৭৪নং ধারায় 'পোটা' (Prevention of Terrorist Activities)-র মতো ব্যবস্থাও রয়েছে। হিন্দুদের অবস্থা হবে ন্যাৎসী জার্মানীর ইহুদীদের মতো। পূর্বকথিত সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচারের জন্য হিন্দুরাই উত্তরদায়ী হবে। ওই আইনের খসড়ার এরকম অর্থ দাঁড়ায় যে, ঘৃণা, অপপ্রচার, দাঙ্গা করা, অসহিষ্ণুতা হলো হিন্দুদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এটাকেই ঐতিহাসিক সত্য এবং সমসাময়িক বাস্তবতা বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। আর এই চরিত্রকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য

হিন্দু নিধনকারী বিল- ২০১১

জয়দীপ রায়

ভাবতে অবাক লাগে স্বাধীনতার ৬৪ বছর পরও ভারতবর্ষের কোনও আইনী বিল প্রস্তুত করতে আমদানি করতে হয় বিদেশী আইন (Rome Statute)। খৃস্টান দুনিয়ার পদধ্বনি শুনতে পাই এই প্রিভেনশন অফ কমিউনাল এ্যন্ড টার্গেটেড ভায়োলেন্স একসেস টু জাস্টিস এন্ড রিপারেসানস বিল ২০১১ (Prevention of Communal and Targeted violance [Access to Justice and Reparations] Bill 2011) এ যা বাদল অধিবেশনে পেশ হতে চলেছে সংসদে।

বিলের প্রথমে Set 3 (c)-এ সংজ্ঞায় (Definition) বলা হয়েছে এই বিলটি, গোষ্ঠী (Group) যার মধ্যে অন্তর্গত কেবলমাত্র ধর্মীয় ও ভাষাগত সংখ্যালঘু এবং তপশীলি জাতি ও উপজাতি (SC/ST) কেবলমাত্র তাদের সুরক্ষার জন্যই রচিত দাঙ্গা কবলিত পরিস্থিতিতে। অর্থাৎ ধরেই নেওয়া হয়েছে যে দাঙ্গা করবেন সংখ্যাগরিষ্ঠ অর্থাৎ হিন্দুরা এবং ক্ষতিগ্রস্ত হবেন ওই Group-এর মানুষজন অর্থাৎ সংখ্যালঘুরা। সুকৌশলে প্রথমেই হিন্দু সমাজকে দ্বিধা বিভক্ত করতে সংখ্যালঘুদের সঙ্গে তপশীলি জাতি ও উপজাতিকে (SC/ST) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

দাঙ্গার বলি বা ক্ষতিগ্রস্ত (Victim) বলতে ওই গ্রুপের অন্তর্গত মানুষকেই বোঝানো হয়েছে Section 3 (j)-তে অথচ হিন্দুরা দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত হলে এই আইন নীরব থাকবে। এই আইনে Sect 6 এ দাঙ্গাকারীর বিরুদ্ধে এই আইন এবং (SC/ST) Atrocities Act অর্থাৎ এক অপরাধে দুই আইন দ্বারা বিচার হবে (Double Punishment), যা আইনের নৈতিকতার বিরোধী।

উল্লেখযোগ্য যে এই আইনের Section 79 যৌন নির্যাতন (Sexual Assault) যেমন গণধর্ষণ বা ধর্ষণের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র ওই Group-এর অন্তর্গত মহিলারাই পরবর্তী সুরক্ষা বা অন্যান্য সুবিধার অধিকারিণী হবেন। কোনও হিন্দু নারী ধর্ষিতা হলে এই আইন দাঙ্গা পরিস্থিতিতে নীরব থাকবে। Section 8 অনুযায়ী ঘৃণা প্রচার (Hate Propaganda) করলে তাকে অপরাধী (Guilty) ধরে নেওয়া হবে বিচারের আগেই। অভিযোগকারী নয়, অভিযুক্তকেই প্রমাণ করতে হবে যে তিনি নির্দোষ। Section 9 বলছে সংগঠিত সাম্প্রদায়িক এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপরাধ (Organised Communal and Targeted Violence) বলে বিবেচিত হবে যদি তা ওই Group এর বিরুদ্ধে হয়। অর্থাৎ হিন্দুদের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত দাঙ্গা হলেও তা এই সংজ্ঞার আওতায় আসবে না।

বলে রাখা প্রয়োজন যে এই বিলের পটভূমিকা ২০০২ সালের গুজরাট দাঙ্গা। Section 20 মতে দাঙ্গা পরিস্থিতি হলেই ভারতীয় সংবিধানের ৩৫৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ গোলযোগ (Internal Disturbance) ঘোষণা করা যাবে। অর্থাৎ কোনও রাজ্যে এই Internal Disturbance ঘোষণা হলে তার পরবর্তী অনুচ্ছেদ ৩৫৬ বলে সেই রাজ্যে জরুরী অবস্থা (Emergency) ঘোষণা করতে পারবে কেন্দ্র সরকার।

দাঙ্গা পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য কেন্দ্র সরকার একটি স্থায়ী জাতীয় সংস্থা (National Authority for Communal Harmony, Justice and Reparation) গঠন করবে। Section 21 অনুযায়ী যার সদস্য থাকবেন ৭ জন। এই ৭ জন সদস্যের মধ্যে Chairperson এবং Vice-Chairperson সহ ৪ জনই হবেন ওই Group অর্থাৎ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত। এই সংস্থা তদন্ত করতে পারবে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে (Suomoto)। এই সংস্থা কোনও ব্যক্তি যার আইনী জ্ঞান নেই তাকেও আইনি প্রক্রিয়া ঠিকমতো চলছে কি না দেখার জন্য আদালতে পাঠাতে পারেন। এই ব্যক্তি (Observer) যার আইনী জ্ঞান আবশ্যক নয়, তিনি শুধু আদালতের কার্য পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্যই রাখবেন না প্রয়োজনে জজ সাহেবের কাজে হস্তক্ষেপও (Intervene) করতে পারবেন। অর্থাৎ বিচার ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপও করতে পারে এই আইন যা গণতন্ত্রের পক্ষে অত্যন্ত বিপদজনক।

জাতীয় সংস্থাকে Section 33 বলে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, যে কোনও ব্যক্তিকে নিয়োগ করতে পারবে পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা, খবর সংগ্রহ, তথ্য ও সাক্ষ্য যোগাড় করা এবং তদন্ত করার জন্য। আশঙ্কার বিষয় এই যে বিশেষ জ্ঞান ছাড়া উক্ত কার্য সম্পাদন করা অসম্ভব। তিস্তা শীতলবাদ বা ওই ধরনের ব্যক্তি যাঁরা মিথ্যা সাক্ষ্য প্রমাণ দিয়ে জাতীয়তাবাদী মানুষের বিরুদ্ধে মামলা করতে অভ্যস্ত, সেই জাতীয় মানুষকে

ম্যাডাম সোনিয়াজীর নেতৃত্বাধীন জাতীয় পরামর্শদাতা পরিষদ বা ন্যাশন্যাল অ্যাডভাইসরি কাউন্সিল ওই বিল পরিকল্পনা ও খসড়া রচনা করেছে। ভারতের পুলিশ, প্রশাসন এবং বিচারবিভাগ পূর্বাগ্রহযুক্ত এবং সংখ্যালঘু বিরোধী--- এই ধারণাও ওখানে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

সেই সেক্যুলার জোট

এই সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজের প্রতি গালাগালি সূচক আইনের উদ্ভব কার মস্তিষ্কপ্রসূত? আগেই বলা হয়েছে সোনিয়া গান্ধীর নেতৃত্বাধীন (চেয়ারপার্সন- ন্যাশন্যাল অ্যাডভাইসরি কাউন্সিল) জাতীয় পরামর্শদাতা পরিষদ এই বিল রচনা করেছে। এই সংবিধান বহির্ভূত সংস্থায় কারা বা কোন্ মানসিকতার লোকেরা রয়েছেন? তিস্তা জাভেদ শীতলাবাদ, হর্ষ মন্দার। আর রয়েছেন জন ডায়ালের মতো আকণ্ঠ বিদেশী অর্থ ও প্রভাব-প্রেরণায় ডুবে থাকা ব্যক্তি। এটা হলো মুসলমান ও খৃস্টান প্রবক্তাদের দেওয়া মুসলমান ও খৃস্টানদের হাতে হিন্দুদের নিগৃহীত করার জন্য একটি বিষভর্তি কৌটো। যা খুললেই সমাজে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা এবং অরাজক পরিস্থিতি পরিব্যাপ্ত হবে। এটা হিন্দুদেরকে খলনায়কে পরিণত করে দেশে সাম্প্রদায়িক রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এক ষড়যন্ত্র মাত্র যা ভারতের একতা ও অখণ্ডতাকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে।

১৯৩০-৪০-এর দশকে মুসলিম লীগ 'সংখ্যালঘু ভিটো' হাসিল করেছিল বিধান পরিষদে। 'সোনিয়া পরামর্শদাতা পরিষদ' তো রাস্তা থেকে সংসদ পর্যন্ত 'সংখ্যালঘু ভিটো' (বিশেষাধিকার)-কে আইনী পোষাক পরাতে চাইছে। এই আইন স্বীয় জঠরেই গৃহযুদ্ধের ভ্রূণ প্রতিপালন করছে। যদি একে বিনষ্ট না করা হয় তাহলে হিন্দু সমাজ ন্যাৎসী জার্মানীর 'ইহুদী জনসমুদায়ে' পরিণত হবে। কিছু খসড়া নিয়ে আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক চলে, কিছু হাস্যাস্পদ হয় আর কিছু খসড়াকে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়। স্বাধীন ভারতে এটা প্রথম খসড়া যার বিষয়ে যে কোনওরকম প্রতিক্রিয়াই যথেষ্ট কম। এটা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া উচিত।

যদি ওইরকম দায়িত্ব দেওয়া হয় তবে তা দেশে এক এবং ভয়ঙ্কর আইনহীন শাসনের অবতারণা করবে। জাতীয় সংস্থা যে কোন আদেশ (Direction) দেবেন রাজ্য সংস্থাকে এবং রাজ্য সংস্থা বিনা প্রশ্নে তা করতে বাধ্য থাকবেন Section 33 (c) অনুযায়ী।

তদন্ত সংবাদ গ্রহণ করার পর জাতীয় সংস্থা ইচ্ছে করলে স্থানীয় আদালতের দ্বারস্থ না হয়ে সরাসরি উচ্চ ন্যায়ালয় (High Court) বা সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় (Supreme Court)-এ আবেদন জানাতে পারবে Section 36 (2) অনুযায়ী। Section 69 অনুযায়ী অভিযোগকারীর অধিকার থাকবে তদন্তের গতি প্রকৃতি, Charge Sheet-এর কপি, সাক্ষীর বয়ান ইত্যাদি সম্পূর্ণ তথ্য পাওয়ার। এবং পুলিশ প্রধান (Superintendent of Police) বা তদন্তকারী পুলিশ অফিসারের কাজ হবে অভিযোগকারীকে সরবরাহ করা। অর্থাৎ পুলিশের কাজে খবরদারি করার জন্য অভিযোগকারীর হাতে অস্ত্র তুলে দিচ্ছে Section 69।

এই বিল আইনে পরিণত হলে সহজে একজন মুখ্যমন্ত্রী সহ তার সরকারকে অপসারণ করা যাবে মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে দাঙ্গার জিগির তুলে। যদি কোনও ভিন্ন রাজনৈতিক দল রাজ্যে শাসন করে এবং অন্য কোনও দল শাসিত কেন্দ্র সরকার ষড়যন্ত্র করে দাঙ্গার পরিস্থিতি সৃষ্টি করে, তবে কেন্দ্র এই আইন বলে খুব সহজে রাজ্য সরকারকে বরখাস্ত করে শাসন ক্ষমতা নিজের হাতে নিতে পারবে।

জাতীয় সংস্থার অধীনে রাজ্য সংস্থা গঠিত হবে Section 44 (3) অনুযায়ী। এই সংস্থাতে সদস্য থাকবেন ৭ জন যার মধ্যে ৪ জন-ই (Chairperson এবং Vice Chairperson সহ) অবশ্য এই Group-এর অন্তর্গত।

এই আইনবলে অভিযুক্ত হলে তা Cognizable এবং Non Bailable হবে। আইনের ভাষায় (CRPC) Cognizable অর্থাৎ পুলিশ যখন কোনও ব্যক্তিকে Warrant ছাড়াই গ্রেপ্তার করতে পারে। এবং Non Bailable অর্থাৎ জামিন অযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে। এই অর্থে কোনও ব্যক্তি যদি সংখ্যালঘুদের আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টায় তাদের তাড়া করে তবেও তা জামিন অযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য হতে পারে যদি ওই ঘটনার অভিযোগ হয় সংখ্যালঘু দ্বারা।

দাঙ্গা পরিস্থিতিতে তদন্ত করার স্বার্থে কোনও পুলিশ আধিকারিক কারও বক্তব্য নিবদ্ধ (Statement Record) করতে পারিবে না CRPC 161 অনুযায়ী। এই বক্তব্য নিবদ্ধীকরণ একমাত্র কোনও নগর দায়রা জজ (Judicial Magistrate) বা ফৌজদারি জজ (Judicial Magistrate)-এর সামনে হবে CRPC 164 অনুযায়ী। এই আইনের Section 64 (3) অনুযায়ী উক্ত বিষয় কার্যকরী হতে পারে যে কোন এলাকার বা রাজ্যের জজ সাহেবের সামনে অর্থাৎ কোন বিচার ক্ষেত্রে (Territorial Jurisdiction) বলে কিছু থাকবে না। বাংলার মাটিতে দাঙ্গা হলে তার Statement Record হতে পারে রাজস্থানের আদালতে। দাঙ্গা-উত্তর পরিস্থিতিতে আইনের প্রক্রিয়া রাজ্যের বাইরে নিয়ে যাওয়ার এক বিশেষ প্রয়াস পরিলক্ষিত হচ্ছে।

কোন সরকারি অধিকারিক (Public Servent) যার মধ্যে আইনের পরিভাষায় মুখ্যমন্ত্রী, সরকারী আমলারাও অন্তর্ভুক্ত, এঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে ফৌজদারী মামলা করতে গেলে CRPC 196, 197 অনুযায়ী উপযুক্ত সংস্থার (Concerned Authority) ছাড়পত্র (Sanction) নেওয়া আবশ্যিক। অথচ এই আইনের Section 77 বলা আছে যে অভিযোগের আবেদনের ৩০ দিনের মধ্যে যদি উপযুক্ত সংস্থা (Concerned Authority) থেকে প্রত্যুত্তর না আসে তবে ধরে নেওয়া হবে যে ছাড়পত্র দেওয়া হলো (Deemed Sanction)। অর্থাৎ যদি কেন্দ্র সরকার মনে করে যে দাঙ্গা পরিস্থিতি দেখিয়ে কোনও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, অন্য মন্ত্রী এবং সরাকারি আমলাদের প্রশাসনের বাইরে স্থান দেবেন তবে সেই কার্য সম্পাদন করতে মাত্র ৩০ বা ৩৫ দিনই যথেষ্ট।

এই আইনের Section 79 অনুযায়ী জাতীয় সংস্থা বিচারপতি (Designated Judge) নিয়োগ করে নূতন আদালত স্থাপন করবেন দাঙ্গা সংক্রান্ত মামলার শুনানির জন্য। এছাড়া অতিরিক্ত বিচারপতি (Additional Designated Judge) নিয়োগ করবেন ওই রাজ্যের বাইরে। অর্থাৎ এই মামলাগুলি এলাকার সাধারণ আদালতের আওতাভুক্ত নয় এবং এই মামলার শুনানি হতে পারে ওই রাজ্যের বাইরে অন্য কোন রাজ্যে। অর্থাৎ গুজরাট দাঙ্গার বিচার হবে দিল্লীতে বা অন্য কোথাও!

অবাক বিষয় এই বিশেষ আদালতের সরকারী আইনজীবী (Special Public Procecutor and Pannel Procecutor) যারা Procecutor বলে পরিচিত তারাও নিয়োজিত হবেন ওই জাতীয় বা রাজ্য সংস্থার দ্বারা।

কোনও একটা দাঙ্গার পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য রাজ্যের হাতে সংবিধান প্রণীত ক্ষমতা এবং Criminal Procedure Code ও Indian Penal Code-এ ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও এই আইনে সেই ক্ষমতা কুক্ষিগত করে হিন্দু- বিরোধী বিশেষ স্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে নিজেদের মনোমত বিচারক, সরকারি আইনজীবী নিয়োগ করে, প্রয়োজনে রাজ্যের বাইরে অন্য কোন রাজ্যে আদলত স্থাপন করে আইন জগতের বাইরের মানুষকে দিয়ে তদন্ত, তথ্য ও সাক্ষ্য সংগ্রহ করিয়ে নিজেদের মত অনুযায়ী অভিযুক্তকে সাজা ঘোষণার এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র রচনা করেছে এবং স্বাধীন বিচার ব্যবস্থাকে নিজেদের হাতের পুতুল বানাবার পরিকল্পনা নিয়েছে।

দাঙ্গা পরিস্থিতিতে কোন হিন্দু যদি প্রতিবাদ জানায় তবে তাকে Section ৮৪-এ এলাকার পক্ষে বিপদজনক আখ্যা দিয়ে ৬ মাস এবং তার অধিক সময়ের জন্য এলাকায় না ঢোকার আদেশ দিতে পারে।

কোনও অভিযুক্ত যার বিরুদ্ধে চার্জ গঠন হয়েছে, তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতা রয়েছে এই আইনের Section ৮২-এ। অর্থাৎ কোনও ব্যক্তি যার বিরুদ্ধে অভিযোগ হয়েছে এবং আদালতে চার্জ গঠন হয়েছে (তদন্তের ভিত্তিতে যে তদন্ত হয়তো করেছেন জাতীয় সংস্থা নিয়োজিত কোনও স্বার্থান্বেষী মানুষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে) তার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা যেতে পারে যদিও তখনও ওই ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হয়নি।

দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত, অভিযোগকারী এবং সাক্ষীদের সুরক্ষার কথা বলা হয়েছে Section 87-এ। তাদের সুরক্ষার স্বার্থে ক্ষতিগ্রস্ত, অভিযোগকারী এবং সাক্ষীদের নাম, ঠিকানা কোন আদেশ (Order), রায় (Judgement), লেখা যাবে না। এই ধারা বলে আদেশ থাকবে যে কোন

ক্ষতিগ্রস্ত, অভিযোগকারী বা সাক্ষীদের নাম, ঠিকানা কাউকে জানানো যাবে না (Non Disclosure)। অর্থাৎ কোনও ব্যক্তির যদি ফাঁসির সাজাও হয়, তিনি জানবেন না যে কাকে হত্যার দায়ে, কার অভিযোগের ভিত্তিতে এবং কাদের সাক্ষীর ভিত্তিতে তার সাজা হলো!

আমরা জানি বিচার ব্যবস্থার, মান-মর্যাদা, নিরপেক্ষতা, স্বাধীনতার স্বার্থে কোনও আদালতের ভিতর ছবি (Photo) তোলা নিষিদ্ধ। অথচ এই আইনের Section ৮৮ অনুযায়ী এই সমস্ত আদালতের প্রতিটি মামলার প্রক্রিয়া (Proceedings) Video Recording আবশ্যিক। অর্থাৎ বিচার ব্যবস্থাকে প্রহসন বানানোর সব রকম প্রচেষ্টা বিদ্যমান।

এই আইনের Section 104 অনুযায়ী হিন্দু বা হিন্দু মঠ, মন্দির, সম্পত্তির ক্ষতিগ্রস্ত হলে ক্ষতিপূরণ (Compensation)-এর কথা বলা নেই। কারণ ধরেই নেওয়া হয়েছে যে দাঙ্গাকারী হিন্দু সমাজ এবং ক্ষতিগ্রস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়।

অভিযোগ প্রমাণিত হলে সাজা যাবজীবন কারাদণ্ড এবং Fine। মজার বিষয় দাঙ্গার প্রয়াস (Attempt)-এর ক্ষেত্রে একই সাজা যাবজ্জীবন। Section 123 এর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার কি হিন্দুদের প্ররোচিত করছে না দাঙ্গার প্রয়াসের ক্ষেত্রেও একই সাজা ঘোষণা করে? মানুষ কি ভাববে না যে কিছু না করেই শুধুমাত্র দাঙ্গার প্রয়াস হয়েছে এই অভিযোগে যাবজ্জীবন কারাগারে থাকার থেকে প্রকৃত দাঙ্গা করে একই সাজা ভোগ করা ভাল!

জাতীয় সংস্থা দ্বারা নিয়োজিত মানুষ এবং সরকারি কর্মী যাদের কাজে নিয়োজিত করা হবে ধরে নেওয়া হবে তারা যা করছেন তা ভালোর জন্য (In Good faith)। তাই এদের বিরুদ্ধে কাজে গাফিলতি বা অন্যায় এর ক্ষেত্রে কোনও অভিযোগ, মামলা বা আইনি প্রক্রিয়া করা যাবে না Section 130 অনুযায়ী।

দাঙ্গা পরিস্থিতিতে কেন্দ্র সরকার চলবে জাতীয় সংস্থার নির্দেশে এবং রাজ্য সরকার চলবে রাজ্য সংস্থার নির্দেশে যা জাতীয় সংস্থার আদেশ মানতে বাধ্য। অর্থাৎ ভারতবর্ষে নির্বাচিত রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকার চলবে মনোনীত সংখ্যালঘু আধিক্য জাতীয় সংস্থার দ্বারা। সংসদীয় গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করে জরুরী অবস্থার পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে এই বিলের বিভিন্ন ধারা উপধারায়। গোটা বিলটিতে সাধারণ বিচার উপেক্ষিত (Violation of Natural Justice).

উল্লেখ্য, এই বিলের একটি বিরাট অংশ নেওয়া হয়েছে রোমের আইন (Rome Statute) থেকে। তবে কি আগামী দিনে আমাদের ভারতবর্ষে আইন তৈরি করবে খৃস্টান দুনিয়ার কেন্দ্র রোম। এর কিছু অংশ নেওয়া হয়েছে "The Communal Violance (Prevention Control and Rehabilitiation of Victims) Bill 2005" যে বিল এখনও সংসদে পাস হয়নি।

বলে রাখা প্রয়োজন এই বিলের খসড়া তৈরি করেছে NAC (National Advisory Council) যার Chairperson Congress-এর অন্তরাত্মা শ্রীমতি সনিয়া গান্ধী। যার সদস্য সকলে হিন্দু বিরোধী বলে পরিচিত এবং সনিয়া গান্ধীর ঘনিষ্ঠ। মনে প্রশ্ন জাগে তবে কি খৃস্টান দুনিয়ার প্রধান পোপের নির্দেশে পরিকল্পিতভাবে হিন্দু নিধনের জন্য এই বিলের অবতারণা। কারণ পোপ ঘোষণা করেছেন এই শতাব্দীর লক্ষ্য এশিয়া মহাদেশ খৃস্টানীকরণ। পরিসংখ্যান বলে সারা ভারতবর্ষে অধিকাংশ দাঙ্গার নায়ক সংখ্যালঘু মুসলিম এবং খৃস্টান সম্প্রদায় অথচ এই বিলে ধরে নেওয়া হয়েছে দাঙ্গাকারী হিন্দু এবং ক্ষতিগ্রস্ত সংখ্যালঘুরা।

এই বিল আইনে পরিণত হলে সহজে একজন মুখ্যমন্ত্রী সহ তার সরকারকে অপসারণ করা যাবে মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে দাঙ্গার জিগির তুলে। যদি কোনও ভিন্ন রাজনৈতিক দল রাজ্যে শাসন করে এবং অন্য কোনও দল শাসিত কেন্দ্র সরকার ষড়যন্ত্র করে দাঙ্গার পরিস্থিতি সৃষ্টি করে, তবে কেন্দ্র এই আইন বলে খুব সহজে রাজ্য সরকারকে বরখাস্ত করে শাসন ক্ষমতা নিজের হাতে নিতে পারবে।

সর্বোপরি এই বিলের ১১০ ধারা অনুযায়ী এই জাতীয় সংস্থা তার দেওয়া ক্ষতিপূরণের পরিমাণ (সংখ্যালঘুদের দেওয়া টাকা) এবং সমস্ত সরকারি এবং বিচার ব্যবস্থার মোট খরচ কোনও ব্যক্তি বা তিনি যে সংগঠন, মঠ, মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত সেই সংস্থা থেকে আদায় করবে এবং প্রয়োজনে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে তা বিক্রী করে অর্থ আদায় (realise) করবে। অর্থাৎ যদি কোনও ব্যক্তিকে কোনও সংস্থা মঠ, মন্দিরের সদস্য প্রমাণিত করা যায় এবং ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই আইনে অপরাধী ঘোষিত হয় তবে জাতীয় সংস্থা ওই সংস্থা, মঠ, মন্দিরের সম্পত্তি থেকে সংখ্যালঘুদের দেওয়া ক্ষতিপূরণ এবং সরকারী খরচ আদায় করবে। এই বিলকে তুঘলকি আইন বললেও কম বলা হয়।

এই বিল ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করতে উদ্ধত। ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক কাঠামোর তিন স্তম্ভকে (Legislature, Judiciary, Administration) ভেঙ্গে দেওয়ার লক্ষ্যেই এই বিল। সমস্ত গণতন্ত্রপ্রিয়, ধর্মনিরপেক্ষ, জাতীয়তাবাদী মানুষ নিজের স্বার্থে, দেশের স্বার্থে, হিন্দুদের অস্তিত্বের স্বার্থে এই বিলের বিরোধিতা করে অগ্রণী ভূমিকা না নিলে অচিরেই হিন্দু জাতির স্থান হবে কেবলমাত্র ইতিহাসের পাতায়। তাই এই কালা আইনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ গড়ে তুলুন ভারতবর্ষের সংসদীয় গণতন্ত্রের স্বার্থে।

(লেখক কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী এবং অখিল ভারতীয় অধিবক্তা পরিষদের পূর্ব ক্ষেত্র সম্পাদক)

রাজস্থানী পাগড়ি

অন্য রকম

নিজস্ব প্রতিনিধি।। পাগড়ি পরিহিত যে স্বামী বিবেকানন্দের বিভিন্ন ছবি দেখতে আমরা অভ্যস্থ, স্বামীজী'র সেই পাগড়িটি তাঁর পারিবারিক সুখ-দুঃখের সাথী, তাঁর একান্ত অনুগত শিষ্য ও অসময়ের বন্ধু খেতড়ি-র মহারাজা অজিত সিংহের দান। বেণীশঙ্কর শর্মা তাঁর 'স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের এক বিস্মৃত অধ্যায়' গ্রন্থে

বেণীশঙ্কর শর্মা জানিয়েছেন, মহারাজা অজিত সিংয়ের (বাঁ দিকে) পরামর্শে 'লু' থেকে বাঁচতে স্বামীজীর পাগড়ি ধারণ। এই রাজস্থানী পাগড়ি আপাতত ইউনেস্কো'র তালিকায়।

লিখেছেন, রাজস্থানের খেতড়ি-তে যে সময় স্বামীজী অবস্থান করছিলেন তখন গরম বাতাস 'লু'-এর দাপট সেখানে প্রবল। এই 'লু'-এর হাত থেকে বাঁচতেই অজিত সিং স্বামীজী-কে মাথায় পাগড়ি গ্রহণের পরামর্শ দেন। অজিত সিং-ই একমাত্র ব্যক্তি, যাঁর কাছে নিজের পরিবারের জন্য বিপদে-আপদে হাত পাততে দ্বিধা করেননি স্বামীজী। স্বামীজী'র শিরে যখন রাজস্থানী পাগড়ি ঠাঁই পেয়েছে, তখন সেই পাগড়ি-র আভিজাত্য নিয়ে কোনও সন্দেহ থাকার কথা নয়।

সেই অভিজাত রাজস্থানী পাগড়ি এবার স্থান করে নিতে চলেছে ইউনেস্কোর 'অনুনভনীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে'র তালিকায়। রাজস্থানের উদয়পুরের পশ্চিমাঞ্চল সাংস্কৃতিক কেন্দ্র (ডব্লিউ জেড সি সি) কেন্দ্রীয় তথ্য-সংস্কৃতি মন্ত্রকের সহায়তায় এ নিয়ে তাদের গবেষণা শেষ করেছে মাস কয়েক আগে। তারপর মরু রাজ্যের পাগড়ি নিয়ে তৈরি হয় একটি তথ্য-চিত্র। এরপর তৈরি হয় একটি ক্যাটালগ। সব মিলিয়ে ইউনেস্কোর কালচারাল হেরিটেজের তালিকায় রাজস্থানের পাগড়ির নাম এমনি এমনি যায়নি, তার জন্য বিস্তর মেহনত করতে হয়েছে আর ইউনেস্কোও সবদিক যাচাই করে তবেই একে তার সাংস্কৃতিক বনেদীয়ানার তালিকায় ঠাঁই দিয়েছে।

ভারতে পাগড়ি কত নামে, কত রূপে যে খ্যাতি লাভ করেছে তার বোধহয় কোনও ইয়ত্তা নেই। সাফা ও সীরপিচ এমনই দু'টো নাম। বহু রঙের যোধপুরী সাফা, সেইসঙ্গে তার একটা লম্বা লেজ, নিঃসন্দেহে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে ইউনেস্কোর প্রতিনিধিদলের। প্রকৃতপক্ষে, উদয়পুরে রয়েছে একটা আস্ত পাগড়ি-সংগ্রহশালাই। যেখানে প্রায় শ'খানেক পাগড়ির সংগ্রহ রয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা বিভিন্ন আমলে বিভিন্ন ধরনের পাগড়ির উদ্ভব হয়েছে। সেই মিউজিয়ামে কালানুক্রমিকভাবে সাজিয়ে রাখা রয়েছে পাগড়িগুলো। পশ্চিমাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের অতিরিক্ত ডিরেক্টর এল এন মন্ত্রী জানিয়েছেন, তাঁরা তিন সদস্যের বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা, ক্যাটালগ তৈরি এবং তথ্যচিত্র নির্মাণের কাজ করেছেন।

সরকারের প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ থেকে জানানো হয়েছে, তাঁদের সংগ্রহে ১৬২২ সালে রাজপুত্র খুররাম ব্যবহৃত পাগড়ি রয়েছে। গত অক্টোবরের শেষে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ গেমসে আহূত মাহিন্দর সিং পরিহারের শিরে শোভাবর্ধন করেছিল যোধপুরী সাফা।

পাগড়ি-বিশেষজ্ঞ হিসেবে শ্রী পরিহারের নাম ইতিমধ্যেই বিখ্যাত। নিদেনপক্ষে ৪০ ধরনের পাগড়ি পরেছেন তিনি। মেওয়ারের শাসকরা তাঁদের ব্যক্তিগত স্টাইলে পাগড়ি পরেন, সেই অনুযায়ীই নামকরণও হয় তাঁদের। বাগলী'র গোঁফের মতোই মেওয়ারের পাগড়ির নাম, যেমন আরশাহী, ভোপালশাহী, ভীমশাহী, আমারশাহী ইত্যাদি। ভাগ্যিস ওদের কোনও সুকুমার রায় নেই। নইলে বলতেন, 'পাগড়ির আমি, পাগড়ির তুমি, পাগড়ি দিয়ে যায় চেনা!'

অসমে সাংসদরাই এলাকা উন্নয়ন তহবিল খরচে ব্যর্থ

সংবাদদাতা।। বরাবর উত্তর পূর্বাঞ্চলকে উন্নয়নের দৃষ্টিতে উপেক্ষা করা হয় বলে বিভিন্ন রাজনৈতিক, অরাজনৈতিক মহল থেকে অভিযোগ ওঠে। কয়েক দশক আগে এজন্য কেন্দ্র ও রাজ্যে উন্নয়ন ও পরিকল্পনা দপ্তর বাদেও জনপ্রতিনিধিদের হাতে সরাসরি উন্নয়নের জন্য এম পি ল্যাড এবং এম এল এ ল্যাড (লোকাল এরিয়া ডেভেল্যপ্‌মেন্ট) খাতে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। ২০০৯-২০১০-এর বরাদ্দ ব্যয়ের যে হিসাব পাওয়া গেছে তাতে দেখা যাচ্ছে অসমের ১৪ জন সাংসদই তাদের এলাকা উন্নয়ন তহবিলের আর্ধেকই খরচ করে উঠতে পারেননি। এই হিসাব ২০১১-র ৩০ জুন পর্যন্ত পাওয়া হিসাব। ইতিমধ্যে সাংসদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল দু'কোটি থেকে ৫ কোটিতে পৌঁছেছে। যারা দু'কোটি টাকাই খরচ করতে পারেন না তারা পাঁচ কোটি কি করে খরচ করবেন? পঞ্চদশ লোকসভায় ৫৬ কোটি টাকা ব্যয় করার জন্য (এলাকা উন্নয়ন খাতে) পাওয়া গেলেও চৌদ্দ জন সাংসদ ৩০ জুন পর্যন্ত ৩৩.৩৯ কোটি টাকা খরচই করে উঠতে পারেননি। চৌদ্দ জন সাংসদ মিলে প্রাপ্ত (এলাকা উন্নয়ন খাতে) অর্থের যে পরিমাণ খরচ করতে পেরেছেন তা সব মিলিয়ে মাত্র ৪১.৯৫ শতাংশ। অর্থাৎ অর্ধেকেরও কম।

সবথেকে খারাপ অবস্থা বরপেটার সাংসদ ইসমাইল হুসেন-এর, তিন কোটির মধ্যে খরচ হয়েছে মাত্র ৩৬ লক্ষ টাকা। তারপর রয়েছেন শিলচরের সাংসদ কবীন্দ্র পুরকায়স্থ। তাঁর এলাকায় খরচ হয়েছে ৪৮ লক্ষ টাকা। অন্য ভাষায় বললে— হুসেন ২.৬৬ কোটি টাকা খরচ করতে পারেননি। কবীন্দ্র পুরকায়স্থ খরচ করতে পারেননি ২.৫২ কোটি টাকা। সর্বাধিক খরচ করতে পেরেছেন ডিব্রুগড়ের সাংসদ পবন সিং ঘাটোয়ার। তিনি তিন কোটি টাকার মধ্যে ২.৪১ কোটি টাকাই খরচ করেছেন।

একনজরে ১৪ জনের হিসাব

ক্রমাঙ্ক	সাংসদ	প্রাপ্ত অর্থ কোটি	সুদসহ প্রাপ্ত অর্থ কোটি টাকায়	ব্যবহৃত অর্থ কোটি টাকায়	অব্যবহৃত অর্থ কোটি টাকায়
১.	বীরেন সিং ইংতি দিফু	৫.০০	৫.১৩	২.২৬	২.৮৭
২.	ইসমাইল হুসেন খাঁন বরপেটা	৩.০০	৩.০২	০.৩৬	২.৬৬
৩.	বদরুদ্দিন আজমল ধুবড়ি	৩.০০	৩.০৭	১.৫১	১.৫৬
৪.	পবন সিং ঘাটোয়ার ডিব্রুগড়	৩.০০	৩.২৬	২.৪১	০.৮৫
৫.	বিজয়া চক্রবর্তী গুয়াহাটি	৫.০০	৫.০১	২.০৬	২.৯৫
৬.	বিজয়কৃষ্ণ হাণ্ডিক জোড়হাট	৫.০০	৫.২২	২.৭৫	২.৪৭
৭.	দীপ গগৈ কালিয়াবর	৫.০০	৫.০০	২.২২	২.৭৮
৮.	ললিতমোহন শুক্লবৈদ্য করিমগঞ্জ (তপশিলী)	৫.০০	৫.০১	২.৬৫	২.৩৬
৯.	এস কে. বসুমাতারি কোকরাঝাড় (এস.টি.)	৩.০০	৩.০৮	০.৬৮	২.৪০
১০.	রানী নারাহ্ লখিমপুর	৩.০০	৩.০৫	০.৫৩	২.৫২
১১.	রমেন ডেকা মঙ্গলদৈ	৩.০০	৩.০২	০.৭৬	২.২৬
১২.	রাজেন গোহাঞি নগাঁও	৫.০০	৫.০১	২.০৯	২.৯২
১৩.	কবীন্দ্র পুরকায়স্থ শিলচর	৩.০০	৩.০০	০.৪৮	২.৫২
১৪.	যোসেফ টপ্পো তেজপুর	৫.০০	৫.০০	২.৭৩	২.২৭

নরওয়েতে হামলার পেছনে কী মুসলিম জঙ্গি?

এবার জঙ্গি হামলা আপাতশান্ত নরওয়েতে। রাজধানী অসলো ও ইউতোয়া দ্বীপপুঞ্জে— সাম্প্রতিক হামলায় শতাধিক লোকের হয়েছে মৃত্যু। আহত বহু। কোনও জঙ্গি সংগঠন হামলার দায় স্বীকার না করলেও পুলিশের উর্দিপরা ৩২ বছর বয়সী অ্যান্ডার্সবেরিং ব্রেইভিক আপাতত সন্দেহভাজন আততায়ী। ব্রেইভিককে পুলিশ পাকড়াও করেছে। চলছে জিজ্ঞাসাবাদ। পুলিশ জানাচ্ছে, ব্রেইভিক রক্ষণশীল খৃস্টান। প্রচণ্ড মুসলিম বিদ্বেষী। ম্যানেজমেন্টে মাস্টার ডিগ্রিপ্রাপ্ত। যদিও সে চাষী। কিন্তু বোমা তৈরিতে পটু। এর কারণও অবশ্য আছে। চাষের কাজে প্রচুর রাসায়নিক সারের প্রয়োজন। তাই সে প্রচুর সার কিনত। কিন্তু সেই সারের একটা অংশ দিয়ে বানাতো বোমা। নিজেরই রয়েছে একাধিক বৈধ বন্দুক। সে বন্দুক চালিয়েই অধিকাংশ লোককে করেছিল হতাহত। খুনের নেশা চেপে বসেছিল তার মাথায়। তবে প্রথমে সে রাজধানীতে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের সামনে ঘটায় বিস্ফোরণ এবং পরে ইউতোয়া দ্বীপে শাসকদল আয়োজিত একটি গ্রীষ্মকালীন শিবিরে নির্বিচারে গুলি চালায়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ব্রেইভিক যদি মুসলিম বিদ্বেষীই হবে তাহলে সে স্বজাতি খৃস্টানদের হত্যা করল কেন? কেন সে মুসলিমদের উপরে হামলা চালাল না? আবার হতাহতদের মধ্যে কোনও মুসলিম আছে বলেও শোনা যাচ্ছে না। কাজেই আততায়ীর 'মোটিভ' নিয়ে ধন্দে পুলিশ। পুলিশ তাই মুসলিম সন্ত্রাসবাদীদের সন্দেহের বাইরে রাখছে না। ব্রেইভিক তাদের 'এজেন্ট' কিনা, পুলিশ খতিয়ে দেখছে।

আল কায়েদা সুপ্রিমো বিন লাদেন ও সন্ত্রাসবাদীদের বহু পাণ্ডা সম্প্রতি নিহত হওয়ার পর আল কায়েদার বর্তমান সুপ্রিমো তথা লাদেনের ডান হাত ও শ্বশুর আয়মান আল জাওয়াহিরি ও তালিবান প্রধান ঘোষণা করেছিল, লাদেনকে হত্যার বদলা তারা নেবে। তারা ইউরোপ ও আমেরিকায় ব্যাপক হামলা চালাবে। আমরা জানি, আল কায়েদা ও তালিবান বহু বছর ধরে প্রচুর টাকার বিনিময়ে পশ্চিমী দেশগুলি থেকে খৃস্টান যুবকদের ইসলামে ধর্মান্তরিত করে সন্ত্রাসবাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে। প্রশিক্ষণ শেষে তাদের হাতে তুলে দিয়েছে এবং এখনও

তুলে দিচ্ছে অস্ত্র। এমনকী, কেউ কেউ মানববোমাও হচ্ছে। ওইসব দেশের মুসলিম যুবকদেরও টাকার বিনিময়ে একাজে নামাচ্ছে। উদ্দেশ্য, যাতে অন্য দেশের বলে তাদের কেউ চিনতে না পারে এবং ভাষাও যাতে সমস্যা না হয়। অর্থাৎ কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা। যে দেশে সন্ত্রাস চালানো হবে, সন্ত্রাসবাদী হবে সেই দেশেরই। এটা তাদের নতুন স্ট্র্যাটেজি'।

নরওয়ে 'ন্যাটো'র সদস্য। অর্থাৎ আমেরিকাপন্থী। তাছাড়া তার কিছু সেনা রয়েছে আফগানিস্তানে মার্কিন সেনার সঙ্গে। এর প্রতিশোধ নিতেই সম্ভবত নরওয়েতে এমন ইসলামিক সন্ত্রাসবাদীদের হামলা। শান্ত নরওয়ে রক্তস্নাত আজ।

—**ধীরেন দেবনাথ, কল্যাণী, নদীয়া।**

শোকসভা না আনন্দ-উৎসব!

গত ২১ জুলাই ২০১১ ব্রিগেডে শহীদদের উদ্দেশ্যে যে শহীদস্মরণ ও মিছিল হয়েছে সেটার সম্পর্কেই এই পত্রের অবতারণা। কিছু কিছু ক্ষেত্রে যে চিত্র ফুটে উঠছিল তাতে স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগতে পারে এই মঞ্চটি ছিল আনন্দের না দুঃখের? কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে মঞ্চে যে বেশ কয়েকজন চিত্রশিল্পী উপস্থিত ছিলেন তাতে দেখে মনে হতেই পারে যে কোনো নতুন সিনেমার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রিমিয়ার শো! যাই হোক এ ব্যাপারে ক্রাউডপুলার স্বর্গত সুভাষ চক্রবর্তীও হার মানবেন। সবথেকে বড় কথা শহীদ স্মরণ ও বিজয় মিছিল যে এক সঙ্গে হতে পারে না তা নিশ্চয় মমতা ব্যানার্জির ন্যায় সংস্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিকে বলে দেওয়া ধৃষ্টতা।

যদি শহীদদের স্মরণসভাই হবে তবে ওই মঞ্চে কেন যে রিজওয়ানুরের মাকে তুলে কিছু বলতে দেওয়া হলো বুঝলাম না। তাহলে কি মমতা ব্যানার্জির মতে রিজও শহীদ এবং ২১ জুলাই পুলিশের গুলিতে শহীদ হয়েছেন? এরকম পরস্পর বিরোধী কতগুলি ঘটনা মমতার মত একটা ব্যতিক্রমী চরিত্রের নমুনা। আর চলচ্চিত্র শিল্পীরা মঞ্চে যা নাচনকোঁদন করছিলেন— শোকসভায় বড়ই দৃষ্টিকটু লাগছিল।

এরপর আসি একজন মুখ্যমন্ত্রীর প্রোটোকলের কথায়। সংখ্যালঘু তোষণের নামে শহীদদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন আসরে রিজ-এর মাকে আনার ঘটনাটিও বেমানান। তারপর ওনাকে কিছু বলতে বলার পর তাকে নিয়ে যেভাবে কোলাকুলি করলেন ও ওঁর বক্তব্যের সবসময়টুকু রিজ-এর মায়ের ঘাড়ে হাত রেখে ও ওঁর মুখের সামনে মাইক ধরেছিলেন সেটা আর যাই হোক একটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পদমর্যাদার কোনও ব্যক্তির পক্ষে বড়ই বেমানান। তার মাকে মঞ্চে তুলে সংখ্যালঘুদের মন ভেজানো হ'লো। কই যে উদ্দেশ্যে শোকসভা সেই ২১ জুলাই-এর শহীদদের কারও স্ত্রী কারও মাকে মঞ্চে তুলে তাদের কিন্তু বক্তব্য রাখতে দেওয়া ও তাদের কারও সঙ্গে কোলাকুলি করার কথা ভাবলেন না কেন? তাহলে মমতা ব্যানার্জি কি শুধু সংখ্যালঘুদেরই মুখ্যমন্ত্রী? ভোটের কাঙ্গালিপনায় মমতা যেভাবে সংখ্যালঘু তোষণ করে চলেছেন ও নিজের পদমর্যাদা ভুলে প্রোটোকল ভেঙ্গে ওদের নিয়ে মাতামাতি করছেন তা বড়ই দৃষ্টিকটু। প্রকাশ্য স্থানে ওই ভাবে করা ওনার পক্ষে একেবারে উচিত নয়।

প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করে ব্রিগেডে যে বিপুল জনসমাগম হয়েছিল তা সত্যই বিরাট ব্যাপার। কিন্তু একই মঞ্চে শোক ও আনন্দের প্রতিফলন বড়ই বেমানান। আর সর্বোপরি মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে কোনো প্রকাশ্য স্থানে কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ের ব্যক্তির ঘাড়ে হাত রাখা বড়ই বেমানান।

—**দেবপ্রসাদ সরকার, মেমারী, বর্ধমান।**

হিন্দু পরিবার-প্রথা ও ইংল্যান্ডের দাঙ্গা

নীতীন রায়

দাঙ্গা হয়েছে লন্ডনে, পুড়েছেও লন্ডন। দাঙ্গায় অংশগ্রহণকারী অধিকাংশ লুটেরাদের বয়স ১২ থেকে ২৩। লারা জনসন এক কোটিপতি ব্যবসায়ীর সন্তান। লুটের মালসহ ধরা পড়েছেন তিনি। হতবাক ইংল্যান্ডবাসী। লুটেরাদের মধ্যে সবচেয়ে যে ছোট তার বয়স ১১। সে মোবাইল লুট করেছে। লুটের দৃশ্য ক্যামেরা-বন্দিও হয়েছে। বিচার শুরু হতেই নূতন নূতন তথ্য সামনে আসছে।

ভূতের মুখে রাম নামের মতোই ইংল্যান্ডেশ্বর ক্যামেরন ঘোষণা করলেন পরিবার ভেঙে যাচ্ছে। সন্তানের খোঁজখবর রাখছেন না বাবা মায়েরা। সন্তানদের মানুষ করতে হবে বুঝতে পেরেছেন ক্যামেরন, তাতেই দেশ ও সমাজ নিরাপদ।

ক্যামেরুন যেন ভারতের ঋষি পরম্পরার কথা বলেছেন। ভারতের ঋষিরা দশ লক্ষণ পালনের মাধ্যমে আমাদের মানুষ হতে বলেছেন। এই দশ লক্ষণ পরিবারেই বিকাশলাভ করে। ঋষি উদ্দালক বিবাহ প্রথার মাধ্যমে পরিবার প্রথার সৃষ্টি করেন। হিন্দু পরিবার প্রথা মানসিক বিকাশের এক প্রক্রিয়া। সন্তান এখানে স্নেহ ভালোবাসায় বড় হয়ে ওঠে। চলার পথে কী করণীয় না করণীয় তারও পাঠ নেয়। কিন্তু পাশ্চাত্যের ভোগবাদী চিন্তাবিদরা বলেছেন, বিবাহ অপ্রয়োজনীয় তাই লিভ-টুগেদারের আমদানি হয়েছে। অনেকে বিবাহিত জীবনকে লীগ্যাল প্রসটিটিউশন বলেছেন। সন্তানকে বলেছেন বাই-প্রোডাক্ট। পাশ্চাত্যের ভোগবাদী আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার কারণে সমাজে বিবাহ প্রথা ভেঙে গেছে। জারজ-রা সমাজ গড়ছে। তাই সন্তান পালনই হচ্ছে না। হিন্দুরা সন্তান উৎপাদন করে থাকে পিতৃমাতৃ-ঋণ শোধ করার জন্য। হিন্দু-জীবনে পরিবার একটা বড় গুরুত্ব বহন করে চলে। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র বনবাস স্বীকার করেছিলেন পিতৃসত্য পালনের জন্য। আবার ভরত রামচন্দ্রের পাদুকা নিয়ে দেশ শাসন করেছিলেন। ভরত ও রাম পারিবারিক দায়বদ্ধতা পালন করেছেন। আবার ধৃতরাষ্ট্র পারিবারিক দায়িত্ব পালন না করে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সূচনা করেছিলেন। গান্ধারী ও কুন্তী পুত্রদের শত লড়াই সত্ত্বেও নিজেদের ছোট করেননি কখনও।

হিন্দু পরম্পরায় হিন্দু পরিবারই শুধু নয়, যৌথ হিন্দু পরিবারও গুরুত্ব পেয়েছে। আইনের জগতেও হিন্দু যৌথ পরিবার স্বীকৃতি পেয়েছে। অন্যান্য ধর্মীয় সমাজগুলোতে পরিবারের গুরুত্ব নেই। খৃস্টান

জ্বলছে ঘরবাড়ি, পুড়ছে গাড়ি— ইংল্যান্ডের সাম্প্রতিক দাঙ্গা।

সমাজে বড়জোর দম্পতি। বাবা মায়ের স্থান বৃদ্ধাবাসে। সেখানে সন্তানেরা ভিজিটর হয়ে যায়। মুসলিম পরিবারগুলো বহুবিবাহের ফলে কলহের স্থানে পর্যবসিত হয়। অনেক সময় পিতাই সন্তানের পরিচয় জানেন না। হিন্দু জীবনে বিবাহ ভেঙে যায় দুর্ভাগাদের। হিন্দু পরিবারে অনেক ব্যক্তি নিজের ব্যক্তিগত জীবনের সবকিছু ত্যাগ করে পারিবারিক দায়িত্ব পালন করেন। আদর্শবান জীবন তৈরিতে হিন্দু পরিবার এক উচ্চতর প্রক্রিয়া। হিন্দু সন্তান মায়ের কোলে রামায়ণ-মহাভারত শোনে এক উচ্চতর আদর্শের সঙ্গে পরিচিত হয়। মায়ের সঙ্গে পূজা-অর্চনার অভ্যাসের মাধ্যমে সে ঈশ্বর-বিশ্বাসী হয়ে উঠে। প্রকৃতির প্রতি তার টান শুরু হয় তুলসীতলায় জল দিতে দিতে। পৃথিবীর মাটিতে হাঁটতে হাঁটতে সে শেখে পৃথিবীর প্রতি দায়বদ্ধতা। পালিকা পৃথ্বী হয়ে উঠে মা বসুন্ধরা। বিদ্যাসাগর কোনও ধর্মীয় গুরুর কাছে শিক্ষালাভ করেননি। হিন্দু মায়ের কোলে বসে হিন্দু হয়ে উঠেছেন। তাই আন্না হাজারে বলেন, আমার প্রতিবাদী সত্তা মায়ের কাছ থেকে পাওয়া। রবীন্দ্রনাথ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পায়ের নীচে বসে আধ্যাত্মিক কবি হয়ে উঠেছিলেন।

কিন্তু হিন্দু পরিবারেও আজ পাশ্চাত্য প্রভাব। বৃদ্ধাবাস বাড়ছে। যৌথ পরিবারের দেখা মেলে না। ভোগবাদী মানসিকতা বাড়ছে। ভারতের রাজনীতিবিদদের যদি ক্যামেরনের মতো বলতে হয় পরিবার ভেঙে যাচ্ছে এর চেয়ে লজ্জার বস্তু আর নেই। আসুন সবাই মিলে হিন্দু জীবন চর্চায় ফিরে যাই।

ষোড়শ মহাজনপদ

কম্বোজ ও মৎস্য

গোপাল চক্রবর্তী

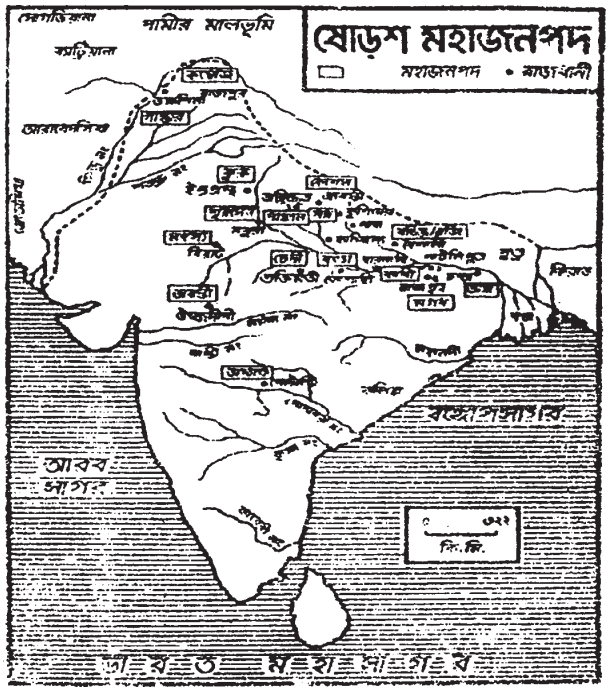

কম্বোজ

কম্বোজ জনপদটির অবস্থান ছিল গান্ধারের নিকট অর্থাৎ ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে। বর্তমান পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কিছু অংশ, হাজারা জেলা এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রাচীন সাহিত্য এবং অশোকের শিলালিপিতে গান্ধার ও কম্বোজের নাম সর্বদা একসঙ্গে দেখা যায়। তাই কম্বোজ রাজ্য গান্ধারের নিকটবর্তী ছিল বলে মনে করা হয়। পশ্চিমে এর সীমা কাফিরিস্থান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মহাভারতে কম্বোজের উল্লেখ আছে এবং মহাভারতে রাজপুরকে কম্বোজের রাজধানী বলা হয়েছে। আর্যরা এক সময়ে কম্বোজে বসতি স্থাপন করলে কম্বোজ বৈদিক ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির কেন্দ্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে। পরবর্তী যুগে আর্য-বসতি গঙ্গা-যমুনা অধ্যুষিত অঞ্চলে বিস্তার লাভ করলে কম্বোজের গুরুত্ব কমে যায়। গবেষক লুভারের তালিকা নং - ১৭২ এবং ১৭৬-এ নন্দীপুরু নামে কম্বোজের অন্য একটি নগরের নাম পাওয়া যায়। আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি কম্বোজ থেকে ক্রমশ সরে এলে কম্বোজের অধিবাসীরা সম্ভবত তাদের আদি আর্য রীতিনীতি ভুলে বর্বর হয়ে গিয়েছিল। ভুরিদত্ত জাতক থেকে আমরা জানতে পারি অনার্য কম্বোজরা বলত- পোকামাকড়, মাছি, সাপ, মৌমাছি, ব্যাঙ ইত্যাদি হত্যা করে মানুষ পবিত্র হতে পারে। যক্ষের নিরুক্ত এবং হিউয়েন সাঙের রাজপুরা-র বিবরণে এর সমর্থন পাওয়া যায়। খৃস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযানের সময় কম্বোজ রাজ্য সম্ভবত ভেঙে যায়। তখন এই অঞ্চলে প্রজাতন্ত্র গড়ে ওঠে।

মৎস্য

প্রাচীন মৎস্য জনপদ বলতে বর্তমান জয়পুরকে বোঝায়। এখানকার সম্পূর্ণ আলোয়ার এবং ভরতপুরের অংশবিশেষ এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই জনপদের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বিরাট। তার নামানুসারে এর রাজধানীর নাম ছিল বিরাটনগর বা বৈরাট। মহাভারতের কাহিনি অনুসারে বারো বৎসর বনবাসের পর এক বৎসর অজ্ঞাতবাসকালে পঞ্চপাণ্ডব পরিচয় গোপন করে বিরাটরাজার আশ্রয়ে ছিলেন। সেই সময়ে বিরাটের বিশাল গোশালার সবল ষাঁড় ও দুগ্ধবতী গাভীগুলি ছিল পার্শ্ববর্তী রাজাদের চরম ঈর্ষার বস্তু। তাই তারা ওই গোশালা লুণ্ঠনের চিন্তা করতো। মহাভারতের বিরাট পর্বে দেখা যায় কৌরবদের পক্ষ হয়ে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রমুখ বীরেরা বিরাটের গোশালা লুণ্ঠন করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু বিরাট রাজপ্রাসাদের রাজকন্যা উত্তরার নৃত্যশিক্ষক বৃহন্নলারূপী অর্জুনের অস্ত্রাঘাতে তারা পলায়ন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। অজ্ঞাতবাসের অবসানে মৎস্য জনপদের উপ্পলব্য নামে নগরে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধমন্ত্রণা শুরু করেন পাণ্ডবেরা। ঋগ্বেদ অনুযায়ী মৎস্য জনপদের অবস্থান ছিল ইন্দ্রপ্রস্থের দক্ষিণ পশ্চিমে এবং শূরসেনের দক্ষিণে। বিরাট রাজার কন্যা উত্তরার সঙ্গে অর্জুন-সুভদ্রার পুত্র অভিমন্যুর বিবাহ হয়েছিল। তাঁদের পুত্র পরীক্ষিৎ পরবর্তীকালে সম্মিলিত কুরু সাম্রাজ্যের সম্রাট হয়েছিলেন।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে সংঘশাসিত রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে মৎস্যের উল্লেখ নেই। সম্ভবত স্বাধীনতা হারানোর পূর্ব পর্যন্ত এই রাজ্যে রাজতন্ত্র বলবৎ ছিল। মৎস্য প্রথমে চেদী রাজ্যের এবং পরে মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। অশোকের অনেক গুরুত্বপূর্ণ লিপি বৈরাটে পাওয়া গেছে।

অমিত মিত্রের কর্পোরেট বাজেট

এন সি দে

অসীম দাশগুপ্তর বাজেটে ছিল মিথ্যাচার, আর এখন অমিত মিত্রের বাজেটে শুধুই অনাচার। ক্ষমতায় বসার ৮৪ দিনের মাথায় তৃণমূল-কংগ্রেস জোট সরকারের কর্পোরেট অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র যেটি পেশ করেছেন, সেটি যে একটি পূর্ণাঙ্গ বাজেট সেই কথাটিরই কোথাও উল্লেখ নেই। বাজেট মানেই আমরা দেখে এসেছি অর্থমন্ত্রীর ঘন্টাধিক সময়ের বাজেট-পাঠ; কখনও টেবিল চাপড়ানো, কখনও হৈ-হৈ করে ওয়েলে নেমে স্পীকারের দিকে তেড়ে আসা। এবার শুধুই যে ২৪ পাতার ডকুমেন্টটি পেশ করা হলো, তার নাম দেওয়া হলো "An abstract of the annual financial statement 2011-12 & Trends of expenditure and growth trajectories" (২০১১-১২ বর্ষের আর্থিক বিবরণের সারসংক্ষেপ এবং ব্যয় ও উন্নয়নের গতি-প্রকৃতি)। তাই সংক্ষিপ্ত আর্থিক বিবরণে কথা ব্যয় করা হয়েছে অত্যন্ত কম। অর্থনীতি ও অর্থনৈতিক অবস্থা, কৃষি উন্নয়ন ও ভ্যাট সম্পর্কে সরকারের অবস্থান নিয়ে কোনও শব্দই ব্যয় করা হয়নি। কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কর বসছে, তার বিন্যাসও দেওয়া হয়নি।

উন্নয়নের নামে দরাজ হাতে অর্থ-বরাদ্দ করেছেন অর্থমন্ত্রী, কিন্তু সে অর্থ কোথা থেকে আসবে তার কোনও হদিশ নেই এই আর্থিক বিবরণীতে। বলা হয়েছে রাজ্যের রাজস্ব আয় ২০১১-১২-তে হবে ৬৫,৮৪৮ কোটি টাকা; অথচ রাজস্ব-ব্যয় হবে ৭৪,১৩৯ কোটি টাকা। তাহলে রাজস্ব ঘাটতি দাঁড়াচ্ছে ৮,২৯১ কোটি টাকা। আর আর্থিক ঘাটতি ধরা হয়েছে ১৫,৫৬০ কোটি টাকা। তাহলে উন্নয়নের জন্য টাকা আসবে কোথা থেকে? অর্থমন্ত্রী তাঁর আর্থিক বিবরণীতে যে হিসাব দিয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে, চলতি অর্থ-বর্ষে রাজ্যের নিজস্ব কর বাবদ আয় হবে ২৭,৬৯০ কোটি টাকা, গতবারের চেয়ে ৬,৩৯০ কোটি টাকা বেশি অর্থাৎ ৩১ শতাংশ বেশি।

কিন্তু কর বাবদ বাড়তি ৩১ শতাংশ আয়ের উৎস কী, তা স্পষ্ট করে বলেননি অর্থমন্ত্রী। শুধু বলেছেন মদে কর বসিয়ে এবার বাড়তি আয় হবে ৬০৬ কোটি আর 'অন-লাইন লটারি'-র উপর কর বসিয়ে বাড়তি আয় হবে ১২৭ কোটি টাকা। অর্থমন্ত্রী বলেছেন চলতি বর্ষে কর বাবদ রাজস্ব আয় হবে আগের বারের চেয়ে ৬,৩৯০ কোটি বেশি। কিন্তু হিসেব তো মিলছে শুধু ৬০৬+১২৭ কোটি অর্থাৎ মোট ৭৩৩ কোটি টাকার, বাদবাকি টাকা আসবে কোথা থেকে?

এখানেই হচ্ছে কর্পোরেট অমিত মিত্রের কর্পোরেট বাজেটের খেল। তিনি নিজেই বলেছেন, ৩১ শতাংশ বাড়তি আয় করাটাও অত

অমিত মিত্র

সোজা নয়। তর্কের খাতিরে যদি ধরেই নিই যে বাড়তি ৩১ শতাংশ অর্থাৎ ৬,৩৯০ কোটি টাকা আয় তিনি করতে পারবেন, তাতে কী তার ঢালাও উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি পালন করা যাবে? যাবে না। এটা কর্পোরেট শিল্পপতি জগতের প্রতিনিধি অমিত মিত্র ভাল করেই জানেন, তাহলে আর কী? সেই কর্পোরেট দাওয়াই! বাজার অর্থনীতি হলো সেই নীতি যার কোনও নীতিই নেই। ঝোপ বুঝে কোপ— এটাই বাজার অর্থনীতি। যেমন অঝোরে কয়েকদিন বৃষ্টি হলে আপনি এক টাকার ফুল পাঁচ টাকা দিয়ে কেনেন, কিংবা তিন মাস আগে টিকিট কেটে পাশে বসে আপনার সহযাত্রী প্লেনে যাচ্ছেন মাত্র তিন হাজার টাকায় আর আপনি ৩ দিন আগে সেই যাত্রার জন্য সেই প্লেনের টিকিট কেটেছেন দশ হাজার টাকা দিয়ে, আবার প্লেন ছাড়ার ১ ঘণ্টা আগে কিছু খালি সীটের জন্য আরও অনেক কম টাকা হাঁকেন দালালরা। এই হলো বাজার অর্থনীতির 'যখন যেমন তখন তেমন'-র সুবিধাবাদী নীতি।

কর্পোরেট অর্থমন্ত্রী কিন্তু তার বিবরণীতে এই 'সুবিধাবাদী' নীতির ইঙ্গিতও দিয়ে রেখেছেন। তিনি বলেছেন, কৃষি, ভূমি, স্ট্যাম্প, রেজিস্ট্রেশন ফি, আবগারি শুল্ক, বিক্রয় কর, বিদ্যুৎ মাসুল, পণ্য ও যাত্রী পরিবহণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে কর বৃদ্ধি ঘটিয়েই এই হিসাব তিনি মেলাবেন। কিন্তু তাঁর নেতৃত্ব তো স্পষ্ট করেই বলে দিয়েছেন যে তাঁদের সরকার মানুষের সরকার, তাই তাদের উপর কোনও কর চাপানো হবে না। তাহলে বিদ্যুৎ মাসুল থেকে ২৬৭ কোটি টাকা বাড়তি আয় কিভাবে আসবে? অন্যান্য ব্যবহার্য বিষয়গুলির উপর কর না চাপিয়েই বা কিভাবে বাড়তি আয় আসবে?

সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন রাজ্যের মানুষের চাকরীর নতুন নতুন সংস্থান তিনি করে দেবেন, অথচ তাঁর অর্থমন্ত্রী প্রথম বাজেটেই বলছেন তিনি বেতন, পেনশন ক্ষেত্রে ব্যয় কমিয়ে আনবেন। কেমন করে? সেটা শ্রমিক-কর্মচারীদের কাছে নিশ্চিত ভাবেই চিন্তার বিষয়। আর যারা এখনও চাকরীই পায়নি তাদের কাছে আরও আশঙ্কার বিষয় হলো যে অর্থমন্ত্রী বলেছেন তাঁরা পরিকল্পনা-বহির্ভূত খাতে ব্যয় ১১ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৪ শতাংশ করছেন। ঠিক তেমনই যাদের চাকুরী আছে তাদের চাকুরীর ক্ষেত্র যদি তিনি সংকুচিত করার পরিকল্পনা করেন, তাহলে নতুন কর্মী নিয়োগ সম্ভাবনা আর থাকবে কেমন করে? এই হলো কর্পোরেট অর্থমন্ত্রীর কর্পোরেট বাজেট। 'ঝোপ বুঝে কোপ' কোথায় ও কাদের মাথায় পড়বে এখন তাই দেখার প্রতীক্ষা!

বিচিত্র খবর বিচিত্র গল্প

।। নির্মল কর।।

বয়স ১০! এখনি যুদ্ধে চল

হাতে তুলে নাও এ কে ৪৭। সামনে তাকাও, গুলি চালাও, বোমা মারো, ল্যান্ডমাইন পোঁতো, খিদে ভোলো, মার খাও। তুমি সৈনিক, শিশু হলেই বা! গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে এই অন্য শৈশব। এরা চাইল্ড সোলজার। অপ্রাপ্তবয়স্ক যোদ্ধা—ছড়িয়ে আছে মধ্য আফ্রিকা থেকে আফগানিস্তান, ইজরায়েল কিংবা শ্রীলঙ্কায়; ভারতে নেপালে, মায়ানমারে আর কঙ্গোয়— গোটা বিশ্বে। মেয়ে হলে তো বিড়ম্বনা বেশি। হাড়ভাঙা খাটুনি, যুদ্ধ কর, কম খাও আর রাত্রে তুমি ভোগ্যপণ্যা!

জল হকি

ইংল্যান্ডের এক খেলাকে নিয়ে বিচিত্র খবর। জলের তলায় হকি খেলা! অতল জলের নিচে বল কাড়াকাড়ির লড়াইয়ে জান লড়িয়ে দিচ্ছে দুই খেলুড়ে। ইংল্যান্ডে চালু এই খেলার নাম 'আন্ডারওয়াটার হকি'। অনেকে আদর করে 'অক্টোপাস' নামে অভিহিত করেছেন। খেলাটি অনুষ্ঠিত হয় সুইমিং পুলের নিচে। দুই দলে প্রত্যেকটায় থাকে আটজন করে খেলোয়াড়। একটি রবারের চাকতির মতো দেখতে বলকে গোলে ঠেলে দিতে পারলেই কেল্লাফতে। গোলের নাম 'গালি'। আন্ডারওয়াটার হকির বলের নাম 'স্কুইড' আর হকি স্টিকের নাম 'পুশার'। ১৯৫৪ সালে এই খেলার জন্ম ইংল্যান্ডে। কিন্তু প্রশ্ন একটাই, এতসব প্রাণী থাকতে খেলার সঙ্গে বারবার অক্টোপাস'কে টেনে আনা কেন?

চু-চেন-তাং

কোনও চৈনিক কবি নন, ইনি রবীন্দ্রনাথ। একবার জন্মদিনে তিনি যখন চীনে, সেদেশের মানুষ তাঁকে জন্মদিনের উপহার দিয়েছিলেন নতুন জামাকাপড়—নীল পাজামা, কমলালেবু রঙের আলখাল্লা আর বেগুনি টুপি। সেসব পরে রবীন্দ্রনাথ প্রার্থনা করেছিলেন তিনি যেন প্রতিদিন সূর্যের মতো নতুন জীবন লাভ করেন। কারণ, চীনারা তাঁর নাম দেন 'চু-চেন-তাং', মানে বজ্রের মতো অপরাজিত ভারতসূর্য।

রঙ্গকৌতুক

শিক্ষক : বল্‌তো, পৃথিবীতে জল না থাকলে কী হোত?
ছাত্র : ভালই হোত স্যর, আমরা কোল্ডড্রিঙ্কস খেয়ে থাকতাম।

***

—নির্বাচনী সভায় পার্টির সমর্থকরা চেয়ার উল্টে মাথায় দিচ্ছিল কেন রে, বৃষ্টির জন্যে?
—নারে, পার্টির গণেশ ওল্টাবার সময় হয়েছে না!

***

প্রশ্ন : আজ তোমার বাংলা পরীক্ষা ছিল না, কেমন দিলে?
পরীক্ষার্থী : ভালই।
—যত ভালই দাও, এবছর বাংলায় মার্কস বাদ যাবেই!

***

—আন্টি, রবিন ট্যাগোরের শ্রাদ্ধ শতবারসিকির চাঁদাটা!
—ট্যাগোরের শ্রাদ্ধ করবে? ঠিক আছে, কাছা পরে এসো, সিকি আধুলি পাবে।

***

স্ত্রী : শোন, ডাক্তার আমাকে পাহাড়ি অঞ্চলে চেঞ্জে যেতে বলেছে। কোথায় যাবে?
স্বামী : অন্য ডাক্তারের কাছে। **—নীলাদ্রি**

মগজচর্চা

১। বারমুডা বৌল (Bermuda bowl) ট্রফি পেতে হলে কোন্ খেলার প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে হয়?
২। হাল্লা দেশের দুষ্টু যাদুকরের নাম কী ছিল?
৩। কোন্ দেশে প্রথাগতভাবে বৃহস্পতিবারে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়?
৪। ভারতের সংসদের প্রথম মহিলা স্পীকার কে?
৫। নেপোলিয়ন সব সময় গলায় একটি কালো রুমাল বেঁধে যুদ্ধে যেতেন। একবারই সাদা রুমাল বেঁধে যুদ্ধে গিয়েছিলেন। কোন্ যুদ্ধে?

—নীলাদ্রি

উত্তর : ১। ব্রিজ (তাস) খেলার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন লিগ, ২। বরফি, ৩। বৃটেনে, ৪। মীরা কুমার, ৫। ওয়াটার্লুর যুদ্ধে।

কেরিয়ারের ঠিক-ঠিকানা

*উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর থেকেই ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের দুশ্চিন্তার অন্ত থাকে না। কী পড়বে, কোন্ কোর্স ভবিষ্যতের নিরাপত্তা দেবে, পড়বেই বা কোথায়— এসবের কিছু সুলুক সন্ধান দিয়েছেন **নীল উপাধ্যায়**।*

গ্রামোন্নয়ন নিয়ে পড়াশুনো

শিল্প ও পরিষেবা ক্ষেত্রে ভারত বিশেষ উন্নতি করলেও কৃষি এখনও গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষত কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে। আজও দেশে ৫২ শতাংশ মানুষেরপ্রধান জীবিকা কৃষি। ফলে গ্রামোন্নয়ন বা রুর‍্যাল ডেভেলাপমেন্ট নিয়ে কাজ করার ইচ্ছে থাকলে তার সুযোগ প্রচুর। গ্রামোন্নয়ন নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার চালু করেছে নানা প্রকল্প। সেইসব প্রকল্পের সার্থক রূপায়ণের জন্য বাড়ছে প্রশিক্ষিত কর্মীর চাহিদা। এই কোর্সে ভর্তি হতে হলে স্নাতক স্তরে কমপক্ষে ৫০ শতাংশ নম্বর পেতে হবে। অধিকাংশ রুর‍্যাল ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠানেই ভর্তি হতে হয় প্রবেশিকা পরীক্ষার মাধ্যমে। ইনস্টিটিউট অব্ রুর‍্যাল ম্যানেজমেন্ট, আনন্দ, গুজরাট-এ (www.Irna.ac.in) পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন রুর‍্যাল ম্যানেজমেন্ট (২ বছর) এবং ফেলোশিপ প্রোগ্রাম ইন রুর‍্যাল ম্যানেজমেন্ট পড়ানো হয়। এছাড়া জেভিয়ার ইনস্টিটিউট অব্ ম্যানেজমেন্ট, ভুবনেশ্বর (www.xibn.ac.in) এবিষয়ে ২ বছরের পুর্ণ সময়ের স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্স করতে হলে আই আর এস এ বা জ্যাট পরীক্ষা দিতে হবে। কাজের সুযোগ রয়েছে বিভিন্ন এন জি ও, সমবায় ব্যাঙ্ক, বিমা সংস্থা, রিটেল পরিষেবা অথবা বহুজাতিক সংস্থায়।

বায়ু-সেনায় যোগ দিতে হলে

যাঁরা আকাশে ওড়ার স্বপ্ন দেখেন, আবার দেশের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে চান, তাঁদের জন্য উপযুক্ত পেশার সুযোগ করে দিচ্ছে ভারতীয় বায়ু-সেনা। এই বিভাগে যোগ দেওয়া যায় আধিকারিক পদে অথবা এয়ারম্যান হিসেবে।

আধিকারিক পদে নিযুক্ত করা হয় তিনটি ভিন্ন শাখায়— (১) ফ্লাইং (জঙ্গিবিমান, মালবাহী বিমান বা হেলিকপ্টার পাইলট, ন্যাভিগেটর), (২) টেকনিক্যাল (যাঁরা বিমানের বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রক্ষেপণ ব্যবস্থার দেখভাল করেন), (৩) গ্রাউন্ড ডিউটি (ফ্লাইং ও টেকনিক্যাল বিভাগে যাঁরা লজিস্টিক, মিটিওরোলজিক্যাল, এডুকেশনাল ও অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্পোর্ট দিয়ে থাকেন। আর এয়ারম্যানদের ক্ষেত্রে রয়েছে টেকনিক্যাল অর্থাৎ যারা বিমান রক্ষণাবেক্ষণ ও উড়ানের নানা বিষয় দেখেন এবং নন-টেকনিক্যাল অর্থাৎ যাঁরা বায়ুসেনার বিভিন্ন বিভাগে সব ধরনের কাজে সহযোগিতা করেন।

মাধ্যমিক বা তার নীচু ক্লাস থেকে শুরু করে উচ্চ-মাধ্যমিক, স্নাতক, স্নাতকোত্তর, ইঞ্জিনিয়ার এমনকী ডিপ্লোমাধারীরা বিভিন্ন সর্বভারতীয় পরীক্ষার মাধ্যমে বায়ুসেনায় যোগ দিতে পারবেন। এই পেশায় আসার ক্ষেত্রে মহিলাদের সুযোগ থাকলেও সবক'টি বিভাগে এবং পূর্ণ সময়ের জন্য সে সুযোগ নেই।

বিশদে জানতে www.careerairforce.nic.in সাইটে বিভিন্ন চাকরি অথবা পরীক্ষা সম্বন্ধে বিস্তারিত জানা যাবে।

অপরাধী ধরার বিজ্ঞান

অপরাধীকে দোষী সাব্যস্ত করার প্রয়োজনে যে-বিজ্ঞান প্রয়োগ বা ব্যবহার করা হয় তাকে বলে ফরেন্সিক সায়েন্স। বিষয়টি পড়ার জন্য উচ্চ-মাধ্যমিকে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি ও গণিত থাকতে হবে। ফরেন্সিক সায়েন্স-এ বিএস্‌সি ও এম এস্ সি ছাড়া ডিপ্লোমা কোর্সও আছে। মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও দিল্লিতে ফরেন্সিক সায়েন্স-এ বিভিন্ন কোর্স আছে। পশ্চিমবঙ্গে নেই। দিল্লির লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব্ ক্রিমিনোলজি অ্যান্ড ফরেন্সিক সায়েন্স-এ (http ://www.nicfs.nic.in/) এই বিষয়ে এম এস্ সি-ও পড়া যায়। বুন্দেলখন্ড ইউনিভার্সিটিতে (http://www.bujhansi.Org/) দু'বছরের এম এস্ সি কোর্স করার জন্য বি এস্ সি (বায়োসায়েন্স অথবা গণিত), তিন বছরের বি এস্ সি করার জন্য ১০+২ পাশ (বিজ্ঞান শাখায়) এবং এক বছরের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমার জন্য বি এস্ সি অথবা এল এল-বি (চাকুরিরত) হওয়া চাই। ফরেন্সিক সায়েন্স-এ এম এস সি এবং পি জি ডিপ্লোমা (এক বছরের) করানো হয়। পাতিয়ালা'র পাঞ্জাবি ইউনিভার্সিটিতেও (http://www.punjabiuniversity.ac.in/)।

বিষয়টি পড়ার পর গবেষণা বা অধ্যাপনা ছাড়াও চাকরি আছে ফরেন্সিক ল্যাবরেটরি ও পুলিশ বিভাগ-এ।

আইনার্চারের নতুন কোর্স

শিক্ষাক্ষেত্রে অতি পরিচিত সংস্থা আইনার্চার এডুকেশনস্ প্রাঃ লিমিটেড। কলকাতার আর এক নামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আই আই এ এস অব ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে সম্প্রতি চালু করল তিনটি নতুন কোর্স। এম বি এ ইন ক্রিয়েটিভ সায়েন্স, এম বি এ ইন ফিনানসিয়াল সার্ভিসেস এবং এম বি এ ইন মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন—এই কোর্স তিনটি আই আই এ এস স্কুল অব্ ম্যানেজমেন্টের বিভিন্ন ক্যাম্পাসে পড়ানো হবে।

আইনার্চারের মূল কেন্দ্র বাঙ্গালুরুতে হলেও সারা দেশজুড়ে আটটি শিক্ষাকেন্দ্র রয়েছে। এবং আই আই এ এস স্কুল অব্ ম্যানেজমেন্টের শিক্ষাকেন্দ্র আছে কলকাতার পাশাপাশি শিলিগুড়ি, দেরাদুন ও গোয়ায়।

কোর্স সংক্রান্ত তথ্য বিশদে জানতে যোগাযোগ করুন : অনুপম মুখার্জি, ০৯৮৭৪৪৫৯৫৫ নম্বরে।

এম সি কেভি তে বি-টেক

ইঞ্জিনিয়ারিং-এর জগতে খ্যাতনামা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এম সি কে ভি শুরু করছে অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ বি-টেক কোর্স। এই প্রথম পূর্ব ভারতে ডিগ্রি লেভেলে চার বছরের সময় সীমার মধ্যে এই কোর্স করাবে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কোর্সটির আসন সংখ্যা ৬০। শিক্ষার্থী নেওয়া হবে জয়েন্ট এন্ট্রান্স উত্তীর্ণ এবং ১০ শতাংশ নেওয়া হবে অল ইন্ডিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ট্রান্স উত্তীর্ণদের মধ্য থেকে। বি-টেক-এর পাশাপাশি অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ এম টেক-ও পড়ানো হবে।

এম সি কেভি হল ভলভো এসার (Volvo Eicher)-এর সঙ্গে যুক্ত একটি প্রতিষ্ঠান। ফ্রান্সের ভ্যাসল্ট সিস্টেমস্-এর সঙ্গে যুক্ত এই শিক্ষাসংস্থা এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য যোগাযোগ করতে হবে : এম সি কেভি ইনস্টিটিউট অব্ ইঞ্জিনিয়ারিং, ২৪৩ জি টি রোড, হাওড়া। ওয়েবসাইট : www.nckvic.edu.in.

ফুল ফোটানোর পাঠ্যক্রম

ফ্লোরিকালচার—ফুল ও বিচিত্র উদ্ভিদের চাষ এবং গবেষণা সংক্রান্ত পড়াশোনা। হর্টিকালচারের এই বিভাগটির সূচনা ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে হয়েছিল ইংল্যান্ডে এবং কালক্রমে তা ছড়িয়ে পড়ে অন্যান্য দেশেও। বর্তমানে সারাবিশ্বে এই শিল্প একটি অত্যন্ত লাভজনক বাণিজ্যে পরিণত হয়েছে। আর প্রশিক্ষিত মানব সম্পদ, কৃষি-উপযোগী আবহাওয়া এবং কৃষি- সংক্রান্ত নানাবিধ গবেষণার প্রেক্ষিতে ভারতে এই শিল্পের বাণিজ্যিক প্রসার তথা কর্মসংস্থানের প্রচুর সুযোগ রয়েছে।

ফ্লোরিকালচার বিষয়টি স্নাতকস্তরে পড়ানো হয় না। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কোর্স না পড়েও অন্য অনেক প্রতিষ্ঠান থেকে ফ্লোরিকালচারে ডিপ্লোমা কোর্স করা সম্ভব। বিজ্ঞান শাখায় উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে সর্বভারতীয় পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া যায়।

দু'টি প্রতিষ্ঠানের নাম : বটানি বিভাগ, হিসলপ কলেজ, নাগপুর। ফোন : ৭১২-২৫৩২০০৪ /২৫২০১৫৮ (www.hislopcollege.ac.in); সেন্টার ফর ডিস্ট্যান্ট এডুকেশন, নর্থ ইস্টার্ন হিল ইউনিভার্সিটি, ওয়েবসাইট : www.nehu.ac.in.

সিউড়িতে সংস্কার ভারতীর অভিনব উদ্যোগ
'মিলন যাত্রায় রাখীবন্ধন'

রাখীপূর্ণিমার পুণ্য প্রভাতে সিউড়ি শহর জুড়ে অনুষ্ঠিত হলো বিশেষ অনুষ্ঠান— 'মিলন যাত্রায় রাখীবন্ধন'। আয়োজক সংস্কার ভারতী'র সিউড়ি শাখা। গত ১৩ আগস্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগকে উপেক্ষা করে সংস্কার ভারতীর দু'শোর বেশি শিল্পীরা একত্রে রাখীসঙ্গীত গাইতে গাইতে পদযাত্রায় পা মেলালেন। অংশগ্রহণকারী মহিলারা লাল পাড় সাদাশাড়ী ও পুরুষেরা সাদা পাজামা পাঞ্জাবী পরে পদযাত্রায় হাঁটলেন। পদযাত্রার শেষভাগে ছিল সুদৃশ্য ভ্রাম্যমান প্রদর্শনী-যান যাতে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ রোধ করার সময়কার রবীন্দ্রনাথের ছবি ছিল। পদযাত্রার সূচনা করেন, সংস্কার ভারতীর সভানেত্রী লোক সম্রাজ্ঞী স্বপ্না চক্রবর্তী। বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন অঞ্চলে ভারততীর্থমঞ্চে সংস্থার শিল্পীরা সঙ্গীত, নৃত্য, কবিতা পাঠ করেন। একই সঙ্গে চলে গান, রাখীবন্ধন। এই মঞ্চে অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন তিলক সেনগুপ্ত। ইন্দিরাচক মোড়ে ভারত বিধাতা মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বীরভূমের অতিরিক্ত জেলাশাসক অমিতাভ সেনগুপ্ত, নেহেরু যুবকেন্দ্র বীরভূম-এর অধিকর্তা শঙ্কর চ্যাটার্জী, লোক সম্রাজ্ঞী স্বপ্না চক্রবর্তী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। অমিতাভ সেনগুপ্ত বলেন, সংস্কার ভারতীর শিল্পীরা শহরজুড়ে যে 'মিলন যাত্রায় রাখীবন্ধন' উৎসবের আয়োজন করেছে তা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য।

বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে পদযাত্রা পৌঁছায় এস পি মোড়-এ ভারতলক্ষ্মী মঞ্চে। সেখানে প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন সিউড়ি পুরসভার পৌরপিতা উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেন, সিউড়ি শহরে রাখীবন্ধন উৎসবের অভিনব উদ্যোগ এই প্রথম। যা সংস্কার ভারতী করে দেখাল।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মের সার্ধশতবর্ষ উদ্‌যাপন ও সংস্কার ভারতীর রজত জয়ন্তীবর্ষ উপলক্ষে এই বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সংস্কার ভারতী।

সমাবেশ সমাচার

পাণ্ডুয়ায় রাখীপূর্ণিমা উৎসব

গত ১৩ আগস্ট হুগলী জেলার পাণ্ডুয়া শাখার উদ্যোগে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের রাখি পূর্ণিমা উৎসব পালিত হয়। উৎসবের প্রধান বক্তা স্বস্তিকা পত্রিকার সম্পাদক ডঃ বিজয় আঢ্য হিন্দু সমাজের সম্মুখে যে প্রধান দুটি চ্যালেঞ্জ— 'Teritorial Unity' এবং 'National Intrigity'-এর বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র চলছে, সেই সম্পর্কে সচেতন করে স্বদেশ ও সমাজকে রক্ষার জন্য সময় দেওয়ার আহ্বান জানান। সভাপতি ছিলেন রবীন্দ্রপল্লী গ্রামের পাণ্ডুয়ার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী গোবিন্দ ঘোষ।

দুর্গাবাহিনীর রাখী উৎসব

গত ১৩ আগস্ট হুগলী জেলার বিভিন্ন গ্রাম ও প্রখণ্ডে রাখী উৎসব পালন করা হয়। মাতৃশক্তি ও দুর্গাবাহিনীর পরিচালনায় মোট ১০ হাজার রাখী বাঁধা হয়। পাণ্ডুয়াতে ৮ জন দুর্গাবাহিনীর বোন প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে বিভিন্ন গ্রামে, প্রতিষ্ঠানে যেমন থানা, জেলখানা, ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস, দোকান, স্টেশনে রাখী বাঁধেন। একাত্মতার এই উৎসবকে কেন্দ্র করে রাখী বাঁধেন– পাণ্ডুয়াতে মাতৃশক্তি প্রান্ত সংযোজিকা সুভদ্রা শর্মা, বৈঁচীতে বিউটি মন্ডল, পোলবা প্রখণ্ডে মিনতি ঘোষ, মাখালডিতে টিনা ঘোষ, সপ্তগ্রামে পূর্ণিমা নায়েক, মগরা ত্রিবেণী, বাঁশবেড়িয়াতে রেবা দাস প্রমুখ।

এছাড়াও তারকেশ্বর জেলায় আরামবাগ, পুরশুড়াতে উৎসব পালিত হয়।

ঋষি অরবিন্দের জন্মদিবসে সাইকেল শোভাযাত্রা

গত ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কলকাতার 'কালীঘাট' নগরের স্বয়ংসেবকরা ঋষি অরবিন্দের জন্মজয়ন্তী পালন করল গণবেশে সাইকেল শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে। ঋষি অরবিন্দের ছোট থেকে বিভিন্ন সময়কার চিত্র, অখণ্ড ভারত সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত বাণীগুলি সাইকেলের সামনে লাগানো হয়। শোভাযাত্রাটি রাসবিহারী, টালীগঞ্জ, কালীঘাট, বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির কাছ দিয়ে, ভাবানীপুর, বালিগঞ্জ সারকুলার রোড, মিন্টো পার্ক হয়ে শেক্সপীয়র সরণীর ঋষি অরবিন্দ ভবনে পৌঁছায়। সেখানে একটি দেশাত্মবোধক গান গেয়ে সকলে শ্রী অরবিন্দকে শ্রদ্ধা জানায়। পরে বৌদ্ধিক প্রমুখ শক্তিশেখর দাস ঋষি অরবিন্দ ও অখণ্ড ভারত সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন।

মীরজাফর যুগ যুগ জীও !

শিবাজী গুপ্ত

বিশ্বাসঘাতকতার উদাহরণ দিতে মানুষ সাধারণত রামায়ণ-মহাকাব্যের অন্যতম চরিত্র রাবণ রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিভীষণ ও পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার সেনাপতি মীরজাফররের নামোল্লেখ করে থাকে। দুজনকেই ঘরের শত্রু ও দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক বলে নিন্দা করা হয়।

পলাশীর আমবাগানে মুসলিম শাসনের অবসান এবং বৃটিশ শাসনের অভ্যুদয় না ঘটলে এতদিনে বিদ্বেষী নবাবী শাসনে বাংলায় 'হিন্দু' বলে কোনও জাতির অস্তিত্ব থাকত না। বৃটিশ শাসনের সূচনায় বাঙালী মধ্যযুগের তামসিকতা থেকে মুক্তিলাভ করে এবং আধুনিক শিক্ষা ও জ্ঞানবিজ্ঞানে বলীয়ান হয়ে সারা ভারতে জীবনের সর্বক্ষেত্রে শীর্ষস্থান দখল

বিভীষণ চরিত্রের কথা আপাতত তুলে রেখে মীরজাফর চরিত্রের দোষগুণ বিচার করা যাক।

বিশ্বাসঘাতকতার প্রশ্নে মীরজাফরের উদাহরণ টানা মানুষের একটা মুদ্রাদোষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ বিষয়ে হিন্দু-মুসলমানের দৃষ্টিভঙ্গীতে কিছু তফাৎ আছে তা স্বীকার করতে হবে। আবেগের আতিশয্যে পলাশীর আমবাগানে বাংলার স্বাধীনতা-সূর্য অস্তমিত হয়েছে বলে হা-হুতাশ করলে কি হবে সে পরিবর্তনের অবদান আমরা বিশেষত হিন্দুরা কি অস্বীকার করতে পারি?

প্রথমত, বঙ্গদেশ সে সময় মোটেই স্বাধীন ছিল না। ছিল বহিরাগত মুসলমানদের শাসনে পরাধীন রাজ্য। ১২শ শতাব্দীর শেষভাগে কুতুবুদ্দিনের সেনাপতি ইখ্‌তিয়ার উদ্দিন মহম্মদ-বিন-বখতিয়ার খলজী বাংলার শেষ হিন্দুরাজা লক্ষ্মণ সেনকে এক আকস্মিক আক্রমণে পরাস্ত করে নবদ্বীপ দখল করে। বাংলায় ইসলামী পৈশাচিক শাসনের সূত্রপাত হয়। দীর্ঘ পাঁচ শতাধিক বছর বাঙালী হিন্দুরা তাদের ধর্মসংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল উত্তর ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং বর্বর মুসলিম শাসনাধীনে থেকে নিজ ধর্মসংস্কৃতি আচার অনুষ্ঠান প্রতিপালনে বাধাপ্রাপ্ত হয়। ক্রমাগত অত্যাচারে ও নিপীড়নে বহুসংখ্যক অনিচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য হয় এবং বাংলায় চিরস্থায়ী মুসলমান শাসন কায়েম হবার পথ সুগম হয়। সেকালে মুসলমান শাসনে বাংলার হিন্দুদের দুর্বিসহ জীবনযাপনের পরিচয় মেলে সমকালীন বৈষ্ণব সাহিত্যে 'চৈতন্যমঙ্গল' এর রচয়িতা জয়ানন্দ মহাপ্রভুর জন্মস্থান নবদ্বীপে হিন্দুদের দুর্দশাময় জীবনের এক মর্মান্তিক চিত্র পাওয়া যায়—

''নবাব ব্রাহ্মণদের ধরে আনে, নষ্ট করে তাদের জাতি, কখনও বা করে হত্যা। যদি কোনও গৃহ হতে শোনা যেত শঙ্খধ্বনি, তবে গৃহস্বামীর ধনসম্পদ বাজেয়াপ্ত হোত, তার জাতি নষ্ট করা হোত, হয়তো বিপন্ন হোত তার জীবন। যারা উপবীত ধারণ করত বা ললাটে আঁকত চন্দন তিলক— তাদের বাড়ি লুঠ করে বেঁধে আনা হোত। ভাঙা হোত মন্দির, উপড়ে ফেলা হোত পবিত্র তুলসী গাছ। নবদ্বীপবাসীরা সর্বদাই প্রাণ ভয়ে দিন যাপন করত। হিন্দুদের গঙ্গায় স্নান নিষিদ্ধ হয়— কাটা হয় শত শত অশ্বত্থ ও কাঁঠাল গাছ।''

হিন্দুদের এই দুর্দশাময় জীবনের অবসান ঘটে ১৭৫৭ খৃস্টাব্দে পলাশীর আমবাগানে। মীরজাফরের সহায়তায় ইংরেজদের জয়লাভে।

সুতরাং মীরজাফরের ব্যক্তিগত উচ্চাশা ও লালসার তৃপ্তিসাধনের ফলশ্রুতিতে এ রাজ্য ইংরেজদের হস্তগত হলে, মুসলমানরা দুঃখে বুক চাপড়ালেও হিন্দুরা যে নবাবের স্বৈরতন্ত্রী শাসন থেকে মুক্তি পেয়েছিল, একথা নিশ্চিত। তাই মীরজাফরকে বিশ্বাসঘাতক বলতে হিন্দুদের মনে সায় দেয় না।

পলাশীর আমবাগানে মুসলিম শাসনের অবসান এবং বৃটিশ শাসনের অভ্যুদয় না ঘটলে এতদিনে বিদ্বেষী নবাবী শাসনে বাংলায় 'হিন্দু' বলে কোনও জাতির অস্তিত্ব থাকত না। বৃটিশ শাসনের সূচনায় বাঙালী মধ্যযুগের তামসিকতা থেকে মুক্তিলাভ করে এবং আধুনিক শিক্ষা ও জ্ঞানবিজ্ঞানে বলীয়ান হয়ে সারা ভারতে জীবনের সর্বক্ষেত্রে শীর্ষস্থান দখল করে। সেসব শীর্ষস্থানাধিকারীর শতবর্ষ, সার্ধশতবর্ষ পালন করে আমরা আত্মতৃপ্তি লাভ করি এবং ইংরেজের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির গায়ে 'হেরিটেজ' তক্‌মা লাগিয়ে আনন্দে বগল বাজাই।

মীরজাফরের সহায়তায় ক্ষমতা দখল না করলে ইংরেজ শাসনের এসব কীর্তিধ্বজার কোনও অস্তিত্ব থাকত না।

শুধু কি তাই এতদিনে হিন্দুজাতি বলে পরিচয় দেবারও কেউ থাকত না বাংলায়। 'স্বস্তিকা' সম্পাদক পরিচিত হতেন বিসমিল্লা খান নামে, আর শিবাজী গুপ্ত লুপ্ত হয়ে সিরাজ মিঞা নামে লম্বা দাড়ি নেড়ে ইসলামী রায়ত আওড়াতেন। মীরজাফর সে সম্ভাবনা আড়াই'শ বছর আগে ঠেকিয়েছিল। সুতরাং মীরজাফর যুগ যুগ জিও!

রঙ্গম

বাস্তব থেকে বহু দূরে

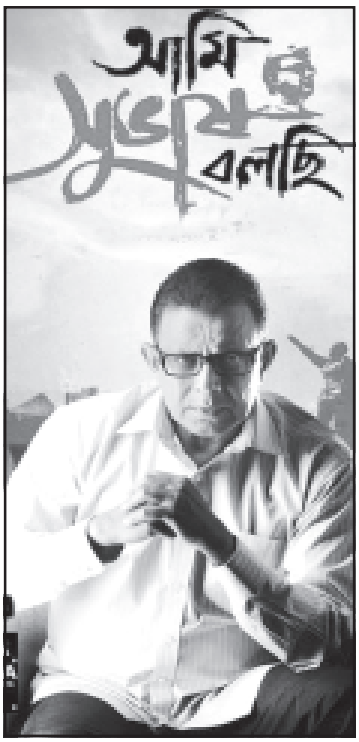

'আমি সুভাষ বলছি'

বিকাশ ভট্টাচার্য

বিগত শতকের ষাটের দশকে শৈলেশ দে-র 'আমি সুভাষ বলছি' বইটি পাঠক সমাজে বেশ সাড়া জাগিয়েছিল। ওই বই-এর চিত্ররূপ ভেবে যদি কেউ 'আমি সুভাষ বলছি' ছবিটি দেখতে প্রেক্ষাগৃহে ছোটেন তাহলে নিরাশ হবেন। শ্রী ভেঙ্কটেশ ফিল্মস প্রযোজিত আলোচ্য ছবিটি একটি সামাজিক ছবি যাতে আত্মবিস্মৃত বাঙালির অতীত গৌরবের কথা সোচ্চারে বলে, প্রফেশনালিজমের অভাবগ্রস্ত, কুঁড়ে, আত্মবিশ্বাসহীন, অন্যকে ছোট করার প্রবণতা সম্পন্ন বাঙালিকে স্বমহিমায় ফেরানোর এক গল্প বলা হয়েছে— যাকে এক কথায় বাস্তব থেকে বেশ দূরেই বলা যায়। 'লাগে রহ মুন্নাভাই'তে যেমন নায়ক মাঝে মাঝেই গান্ধীজীকে দেখে নিজের কাজগুলো করে বাজিমাৎ করছিল; এখানেও নায়ক দেবব্রত বোস এক মধ্যবিত্ত ব্যাঙ্ক কর্মচারী, অবাঙালি প্রমোটার গোয়ালিয়ার কাছে নিজের বাড়ি বিক্রি করে দেওয়ার অসহ্য চাপ সহ্য করতে পারছিল না, ব্যাঙ্কে অবাঙালী ম্যানেজারের কথায় কথায় হেয় করার চেষ্টা বা ছেলের পনেরো লক্ষ টাকা ক্যাপিটেশন ফি দিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে চাওয়ার অবুঝ বায়না মেটাতে না পেরে হীনমন্যতায় ভুগছে— তখনই দেখা পায় নেতাজী সুভাষচন্দ্রের। তিনি দেবব্রতকে সাহস জোগান। মাথা তুলে দাঁড়াতে বলেন। পরিস্থিতির সামনে এগিয়ে যেতে বলেন। বাঙালির অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। দেবব্রত এরপর থেকে প্রতিটা আক্রমণের যোগ্য প্রত্যাঘাত করে সাহসের সঙ্গে। এবং অদ্ভুতভাবে দেখে পরিস্থিতি তার অনুকূলে আসছে।

নির্দেশক মহেশ মঞ্জরেকর মারাঠি ও হিন্দী ছায়াছবি জগতের এক প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব। তাঁর মারাঠি ছবি 'ম্যায় শিবাজিরাও ভোসলে বলতু'র বাংলা কপিরাইট কিনে ভেঙ্কটেশ ফিল্ম মহেশজীর হাতেই নির্দেশনার দায়িত্ব তুলে দিয়েছেন। ফলে একজন বাঙালি নির্দেশক ছবিটি করলে যতটা স্মার্ট হোত— ততটা স্মার্ট এবং বাস্তবসম্মত হয়নি। চিত্রনাট্য আরও ভালো— আরও বাঙালিয়ানাসম্পন্ন হতে পারতো।

তবে নায়ক দেবব্রত বোসের চরিত্রে মিঠুন চক্রবর্তীকে নির্বাচন করে প্রযোজক-পরিচালক যথেষ্ট বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন। মিঠুনের কাছে ছবিটি মোস্ট ইমপর্ট্যান্ট। তিনি বলেছেন, টিপিক্যাল ভ্যাবলা বাঙালি হয়ে বাঁচতে চাইনি কোনওদিন, ঠিক সেটাই করেছি ছবিতেও। প্রত্যেকে যদি নিজের কাজটা ঠিকভাবে করে, দায়িত্ব সচেতন হয়, তাহলে রাজ্যের শ্রীহীন চেহারা বদলে যাবে দ্রুত। বস্তুত এমনই বহু ডায়লগ আছে ছবিতে। ছবিটা দেখতে বসে কিন্তু এত সত্ত্বেও অনুপ্রাণিত হওয়া গেল না। মনে হলো এসবই কষ্টকল্পনা। ছবির শেষ ভাগটাতো একেবারে গতানুগতিক আর পাঁচটা বাণিজ্যিক বাংলা ছবির কার্বন কপি। 'চাঁদনী রায়', 'পেজ থ্রি' প্রভৃতি অন্যধারার বলিষ্ঠ হিন্দি ছবির পরিচালক মহেশ মঞ্জরেকরকেও খুঁজে পাওয়া গেল না। তবু একটা দৃশ্য-কল্পনার জন্য তাঁকে সাধুবাদ দেবো। যেখানে নেতাজী দেবব্রতকে পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য শিবাজী মহারাজের মতো কূটবুদ্ধিসম্পন্ন হওয়ার কথা বলেন। এবং শিবাজী-আফজল খাঁর ঘটনার দৃশ্যায়ন দেখা যায়। দৃশ্যটি মূলত মারাঠি গানের সঙ্গে দেখানো হয়েছে। মূল গানের সুর মারাঠি— গানের কথা বাংলায় অনুবাদ করায় সুর-কথার মিলমিশ হয়নি। তবে দৃশ্যটি অনবদ্য।

ছবির শিল্পীদের মধ্যে লাবণী সরকার, সাহেব ভট্টাচার্য, বরখা বিস্ত চরিত্র অনুযায়ী ভালো অভিনয় করেছেন। শিবাজী-আফজল দৃশ্যে শিবাজীর ভূমিকায় নির্দেশক একটু মুখ দেখিয়েছেন। সব মিলিয়ে ছবি যেমনই হোক না কেন, মেসেজটা কিন্তু মনকে নাড়া দেয়। বলতে ইচ্ছে করে,...''রোজ কত কি ঘটে যাহা তাহা, এমন কেন সত্যি হয় না আহা!"

শব্দরূপ-৫৯৪ ঐন্দ্রিলা আঢ্য

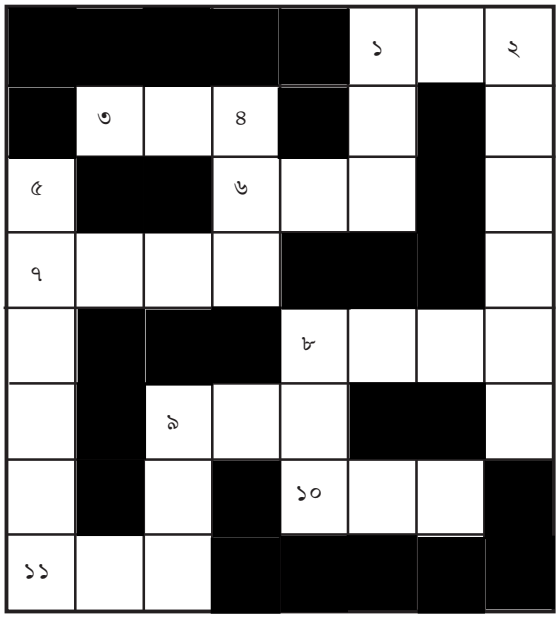

সূত্র :

পাশাপাশি ঃ ১. তৎসম শব্দে বন, তিনে ঈঙ্গ দ্বিতীয় অক্ষর, **৩.** দুর্গা, **৬.** গোবাঘ-এর অন্য নাম, আগাগোড়া আক্রমণ, **৭.** শিবের রুদ্ররূপ, **৮.** শৌখিনতা, অমিতব্যয়িতা, **৯.** বিশেষণে ব্যর্থ হয় না এমন, অব্যর্থ, **১০.** সূর্যের কন্যা, **১১.** পায়রা।

উপর-নীচ ঃ ১. হনুমানের মাতা, টলিউডের ভৌমিক অভিনেত্রী, **২.** ১৯০১ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত, এক-চারে কুড়ি, **৪.** দেশি শব্দে ঢাক জাতীয় চর্মবাদ্যবিশেষ, **৫.** হিন্দুদের বিখ্যাত তীর্থস্থান, দুয়ে-তিনে নশ্বর, শেষ তিনে কাঁটা, **৮.** বৃদ্ধাঙ্গুলির ডগা থেকে কনিষ্ঠার ডগা পর্যন্ত মাপ, **৯.** সুধা।

সমাধান
শব্দরূপ-৫৯২

■	■	মে	ঘ	না	দ	■	নি
ম	গ	ধ	■	■	স্ত	■	মা
■	ণ	■	■	■	ক	সা	ই
বি	দে	শি	নী	■	■	ব	■
■	ব	■	■	রা	স	লী	লা
বা	তা	সা	■	■	■	ল	■
ম	■	ধ	■	■	বা	তা	স
নি	■	না	চি	কে	ত	■	■

সঠিক উত্তরদাতা

শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯
অসীম দে
সাহাপুর, মালদহ

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

● ৫৯৪ সংখ্যার সমাধান আগামী ১২ সেপ্টেম্বর, ২০১১ সংখ্যায়

।। চিত্রকথা।। সর্প যজ্ঞ।। ১৯

ভিন্ন ভাবনার চিন্তন, নব-চেতনায় অবগাহন

স্বস্তিকা পুজো সংখ্যা, ১৪১৮

—: উপন্যাস :—

নবকুমার বসু, সৌমিত্র শঙ্কর দাশগুপ্ত, সুমিত্রা ঘোষ, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়।

—: প্রবন্ধ :—

আজকের খৃস্টধর্ম যীশু প্রচারিত ধর্ম নয়। সাম্প্রতিক জাপান এবং আমাদের শক্তি ভাবনার পুনর্বিন্যাস। শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ও পশুপাখি। কেন হিন্দুরা এরকম? হরিশ মুখোপাধ্যায় : নির্ভীক সাংবাদিকতার প্রতীক। চার্চিলের গোপন যুদ্ধ কাদের বিরুদ্ধে? সখারাম গণেশ দেউস্কর— শতবর্ষ পরে। ডিজি-র রবীন্দ্রনাথ।
বাঙালির ভাঁড়ার ঘরের ইতিবৃত্ত। উত্তরবঙ্গের দেবী দুর্গার সন্ধানে।

—: গল্প :—

গোপালকৃষ্ণ রায়, রমানাথ রায়, শেখর বসু, দীপঙ্কর দাস, জিষ্ণু বসু, গোপাল চক্রবর্তী।

—: রম্যরচনা :—

চণ্ডী লাহিড়ী। দেবীবন্দনা—শঙ্কর দেবানন্দ মহারাজ।

এছাড়াও ভ্রমণসহ আরও অনেক কিছু। সব মিলিয়ে পরিবারের ছোটবড় সকলের সঙ্গে ভাগ করে পড়ার মতো একটি সংরক্ষণযোগ্য পুজো সংখ্যা।

সত্ত্বর কপি বুক করুন।

মহালয়ার পূর্বেই প্রকাশিত হবে। দাম : ৫০ টাকা।

Swastika RNI No. 5257/57
29 August - 2011
Registration No. Kol. RMS/048/2010-2012
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. MM&P.O./SSRM-Kol. RMS/RNP-048/LPWP-028/2010-12

দাম : ৫.০০ টাকা